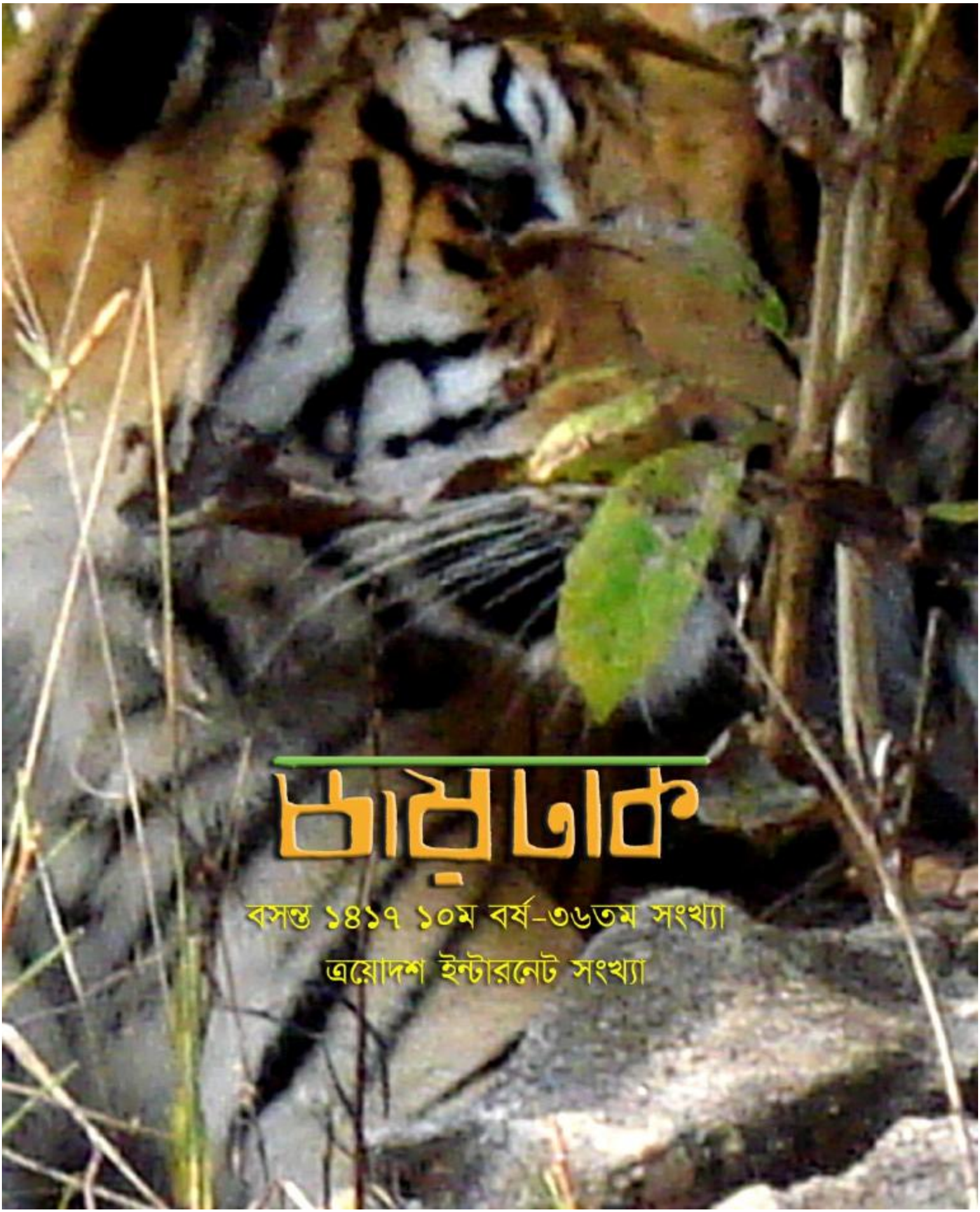

চারুলতা

বসন্ত ১৪১৭ ১০ম বর্ষ-৩৬তম সংখ্যা
ত্রয়োদশ ইন্টারনেট সংখ্যা

জয়ঢাক ৩৬

সূচিপত্র

	টপিক		লেখা/বিষয়	ছবির সংখ্যা	লেখক	ছবি/গ্রফিক্স
(১)	মলাট			(১)		দেবজ্যোতি
(২)	জয়ঢাকের দলবল			(১)		
(৩)	আমাদের কথা			(১)	দেবজ্যোতি	দেবজ্যোতি
৪)	সমপাদকীয়		জয়ঢাকি বোল	(১)	গৌরী গাঙ্গুলি	মৌসুমি
৫)	কমিকস		রূপকথা	(৬)	দেবজ্যোতি	মৌসুমি
৬)	গল্প	(ক)	বিচ্ছুর বুদ্ধি	(৫)	শর্মিষ্ঠা খাঁ	সোমা
		(খ)	দুষ্টু বন্ধু	(২)	সুমন কুমার নায়েক	সৌভিক
		(গ)	অমরগাথা (অনু:)	(১)	অ্যাসিমভ(অনু:অমিত দেবনাথ)	দীপংকর
		(ঘ)	সবুজ সবুজ আলো	(৩)	গার্গী	সৌভিক
৭)	ভ্রমণ		মেঘবাড়ির ডায়েরি	(৪)	ড: পি বি গঙ্গোপাধ্যায়	লেখক
৮)	বিচিত্র দুনিয়া		রিকশার ইতিকথা	(৫)	অরিন্দম দেবনাথ	সংগৃহীত
৯)	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	আপেক্ষিকতা	(১)	বৈজ্ঞানিক	দেবজ্যোতি
		(খ)	টেকনো টুকটাক	(২)	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(গ)	ভারতের বৈজ্ঞানিক (শ্রীসেন)	(১)	টুপুর	সংগৃহীত
১০)	বনের ডায়েরি	(ক)	বুলঢানার বাঘ	(৩)	জে জে দত্ত	মৌসুমী
		(খ)	ভারতের বনাঞ্চল (নীলগিরি)	(২)	সংহিতা	সংগৃহীত
১১)	ছড়া	(ক)	গ্রীষ্মের ছড়া	(১)	শেখর রায়	মৌসুমি
		(খ)	কেষ্ট পাড়ুই	(১)	তরুণ সরখেল	সোমা
		(গ)	হিংসুটি	(১)	বৈষ্ণবী	সোমা
		(ঘ)	হাকিমপুর	(১)	জ্যোতির্ময় মল্লিক	সোমা
		(ঙ)	দুষ্টু ছেলে	(১)	আশুতোষ ভট্টাচার্য	ইন্দ্রশেখর
		(চ)	আপনি বেজায় বৃদ্ধ মানুষ	(১)	আবু হোসেন	সৌভিক

১২)	দেশ ও মানুষ----------		গর্দভরাজের মেলা----------(১)	----------	সংগৃহীত
১৩)	ধাঁধা মজা রহস্য----------	(ক)	ধাঁধা----------(১)	ইন্দ্রশেখর	মৌসুমী
		(খ)	মজার ইন্টারনেট----------(৩)	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(গ)	কুইজ----------(০)	ইন্দ্রশেখর	-----
		(ঘ)	ডুডল---------- (১)	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ঙ)	জানো কি----------(০)	ইন্দ্রশেখর	------
		(চ)	হযবরল ---------- (১)	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ছ)	অবিশ্বাস্য---------- (১)	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(জ)	মজার খেলা----------(১)	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ঝ)	গত সংখ্যার উত্তর----------(১)	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ঞ)	কীসের ফটো----------(১)	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
১৪)	ধারাবাহিক উপন্যাস----------		বগাচি জাতির সন্ধানে----------(৩)	শৌনক হালদার	মৌসুমী
১৫)	কাতুকুতু----------		কাতুকুতু---------- (১)	----------	ইন্দ্রশেখর
১৬)	লিখিব খেলিব----------	(ক)	ভূত----------(১)	মুকুট	মুকুট
		(খ)	উল্টো মানুষ----------(১)	প্রমণা	ইন্দ্রশেখর
		(গ)	কার্টুন (ছোটগল্প)----------(১)	মঞ্জিমা গুহ মজুমদার	মহাশ্বেতা
		(ঘ)	গ্যালারি----------(১)	৪টি ছবি একসাথে	অম্বিকা, আনন্দমোহন, শময়িত্রী ও বউল,
১৭)	পুরান কথা----------		একটি বন্ধুত্বের গল্প----------(৩)	টুপুর	সংগৃহীত
১৮)	রাশিয়ান গল্প----------		রাজপুত্র ইভান ও ধূসর নেকড়ে-------(১)	আই কারনখোভা	দীপংকর
১৯)	পুরাতনী----------		প্লুটোর অভিশাপ----------(৩)	দিলীপ রায়চৌধুরি	মৌসুমি
২০)	সেই আয়না----------		সেই আয়না----------(২)	সুজয় রায়	মৌসুমী
২১)	স্মরণীয় যাঁরা----------		জর্জ সুদর্শন----------(১)	-------	সংগৃহীত
২২)	সুরঢাক----------		এসো গান শুনি-------(লেখাটা একটা ইমেজ ফাইলে দেয়া হয়েছে)--	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	লেখক

২৩)	খেলা----------খেলার রাজা পর্বতারোহণ----------(১)	বাসব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত
২৪)	টাইম মেশিন----------ঠগির আত্মকথা----------(২)	অলবিরুণী	মৌসুমী
২৫)	বই পড়া----------হলুদ সূর্যমুখী ও রঙিন প্রজাপতি-----(১)	মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
২৬)	লোককথা----------আনানসি গেল মাছ ধরতে----------(১)	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	মৌসুমী
২৭)	ট্রেকিং----------হিমালয়ের হিমবাহ পরিচিতি ও ট্রেকিং রুট(৩)	রাজকুমার রায়চৌধুরী	লেখক
২৮)	ভূগোল----------এরিট্রিয়া----------(৩)	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

অক্ষরবিন্যাসে

রমা একটি প্রকাশনা সংস্থার মালিক

নন্দিনী ইশকুলে পড়ায়

কবি শান্তনু পাহাড়ে যায়, চাকরি করে

তুলিতে মাউসে ক্যামেরায়

সোমা

সোমা ভারতের সবচেয়ে বড়ো ব্যাংকে চাকরি করে

মৌসুমী দশটা ছ'টা অফিস করে

মৌসুমী

সৌভিক

সৌভিক বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করে

দীপংকর ন্যাশনাল ইনসটিট্যুট অব ডিজাইন -এর ছাত্র

দীপংকর

হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ওরা সবাই তুলিতে মাউসে ক্যামেরায় ও কিবোর্ডে ছবি বানিয়ে ও অক্ষর সাজিয়ে এই সংখ্যার জয়ঢাককে তোমাদের সামনে হাজির করেছে।

জয়ঢাকের কাজ করতে এগিয়ে এসেছে ইশকুলপড়ুয়ারাও। অক্ষরবিন্যাসে, বুক রিভিউতে এবং ছবি আঁকায়। এইখানে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম–

মহুল
অক্ষরবিন্যাস

মহাশ্বেতা
ছবি আঁকা, বুক রিভিউ

মুকুট
ছবি আঁকা

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদদেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পু:নি:)
অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়
আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুদ্দুস।
ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, প্রযত্নে সুচেতনা প্রকাশন,
১৬এ টেমার লেন। কলিকাতা-৯
মেইল যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

জয়ঢাকি বোল

এইবারে ঝড়ের ঋতু গ্রীষ্মকাল। ভারত জুড়ে নানা জায়গায় এ সময় ঝড় ওঠে। ইংরিজিতে নর-ওয়েস্টার নামে পরিচিত এই ঝড়ের নাম এদেশে কোথাও আঁধি, কোথাও বা কালবৈশাখি। তেমনই এক ঝড়ের খবর এইবারের জয়ঢাকি বোলে। লিখে পাঠিয়েছেন তোমাদের গৌরীদিদিমণি।

ঘন্টা বাজে মনটা নাচে এবার স্কুলের ছুটি
মাঠবরাবর ছুট মেরেছি ভাইবোনেতে দুটি
একূল ওকূল যায় না দেখা হয় না মাঠের শেষ
ভাবছি কোথায় এলাম? এ কি তেপান্তরের দেশ?
হঠাৎ দেখি মাঠের কোণায় আঁধার ঘনায় কালো
হুড়মুড়িয়ে উড়িয়ে ধুলো কালবোশেখি এলো
উপড়ে খোঁটা ছুটছে গরু ঘরের দিকে ওই
ঝড়ের হাওয়ায় আসছে উড়ে খড়ের ঘরের ছই
পাগলপারা পাখপাখালি দিগবিদিকে ছোটে
ঝড়ের হাওয়ায় পথের ধুলো মাথায় গায়ে ওঠে।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলেও ছাতা খোলাই দায়
হাতের খোলা রঙিন ছাতা উল্টালো হাওয়ায়।

দৌড়ে গিয়ে মাটির ঘরের ছাঁচতলাতে উঠি
তাকিয়ে দেখি মা যে বসে জড়িয়ে ঘরের খুঁটি
আমায় দেখে আদর করে জড়িয়ে নিল কোলে
যেমন করে হাওয়ার বুকে বৈশাখি মেঘ দোলে।

ভালো থেকো গ্রীষ্মকালে। পেট ভরে ফল খেও। গ্রীষ্ম তো ফলের ঋতু। আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল ফুটি, তরমুজ-বলে বলে ফুরোয় না। শহরে ঝড় দেখা যায় না। তাই বলি, কখনও যদি গ্রামের দিকে যাও আর ঝড় ওঠে , তো ঘরের ভেতর লুকিয়ে না থেকে দুচোখ ভরে ঝড় দেখো। অমন দৃশ্য হলিউড বা বলিউডের থ্রিলার ছবিতেও মিলবে না।

ভালোবাসায় , তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা।

রূপকথা
লেখা : দেবজ্যোতি
ছবিঃ মৌসুমী

অনেক দূরে আরও দূরে
অজস্র লাইট ইয়ার
ছাড়িয়ে গিয়ে প্রাসাদ ছিল
রাজকুমারী হিয়া-র
সোনার বরণ রাজকন্যা
মেঘের বরণ চুল
সেই চুলে সে রাখত গুঁজে
লেজারমনির ফুল
প্রাসাদ জুড়ে এদিক সেদিক
হলোগ্রামের খেলা
ভিবজিওরের হিসেব মেনে
রামধনুকের মেলা।

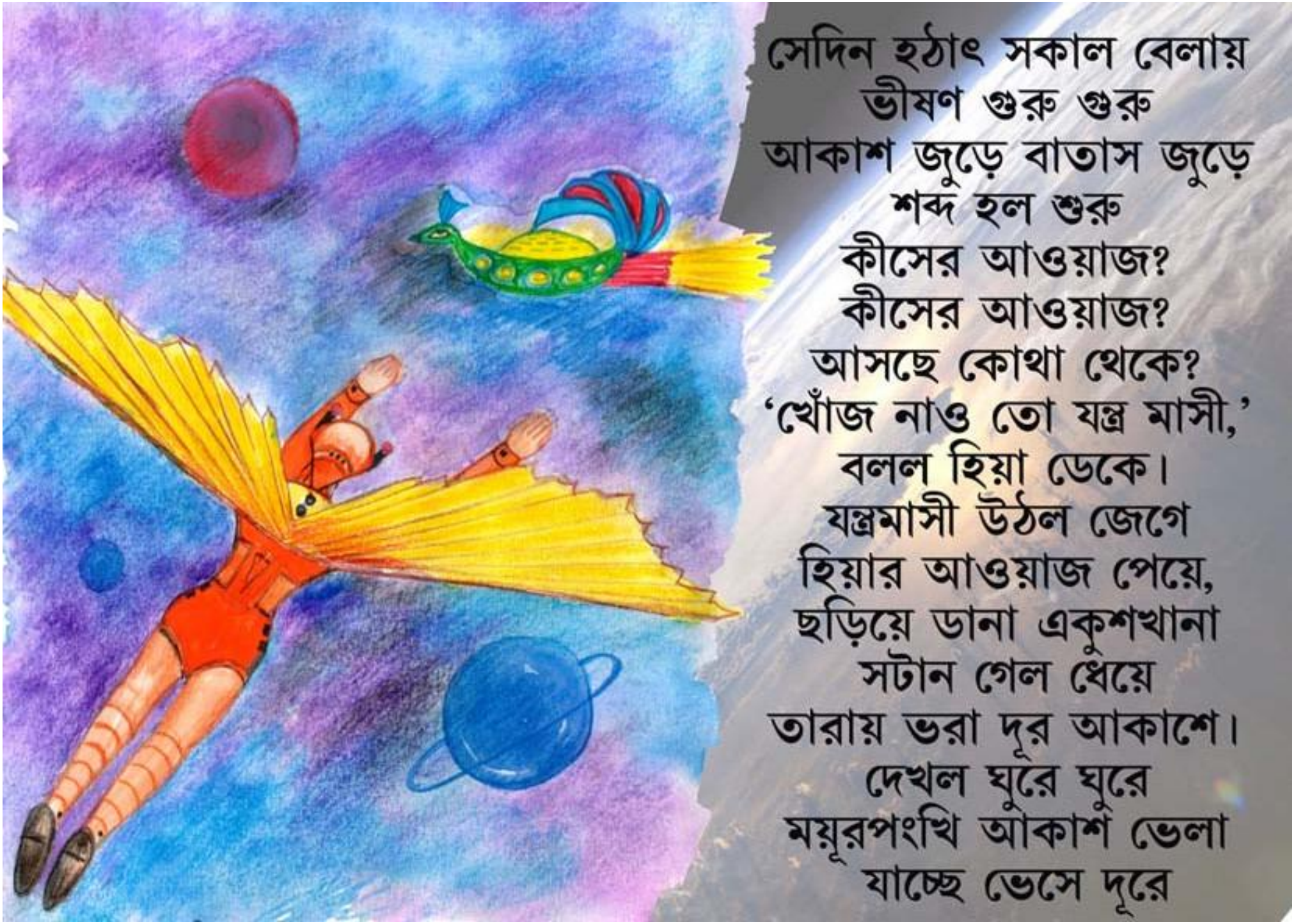

সেদিন হঠাৎ সকাল বেলায়
ভীষণ গুরু গুরু
আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে
শব্দ হল শুরু
কীসের আওয়াজ?
কীসের আওয়াজ?
আসছে কোথা থেকে?
‘খোঁজ নাও তো যন্ত্র মাসী,’
বলল হিয়া ডেকে।
যন্ত্রমাসী উঠল জেগে
হিয়ার আওয়াজ পেয়ে,
ছড়িয়ে ডানা একুশখানা
সটান গেল ধেয়ে
তারায় ভরা দূর আকাশে।
দেখল ঘুরে ঘুরে
ময়ূরপংখি আকাশ ভেলা
যাচ্ছে ভেসে দূরে

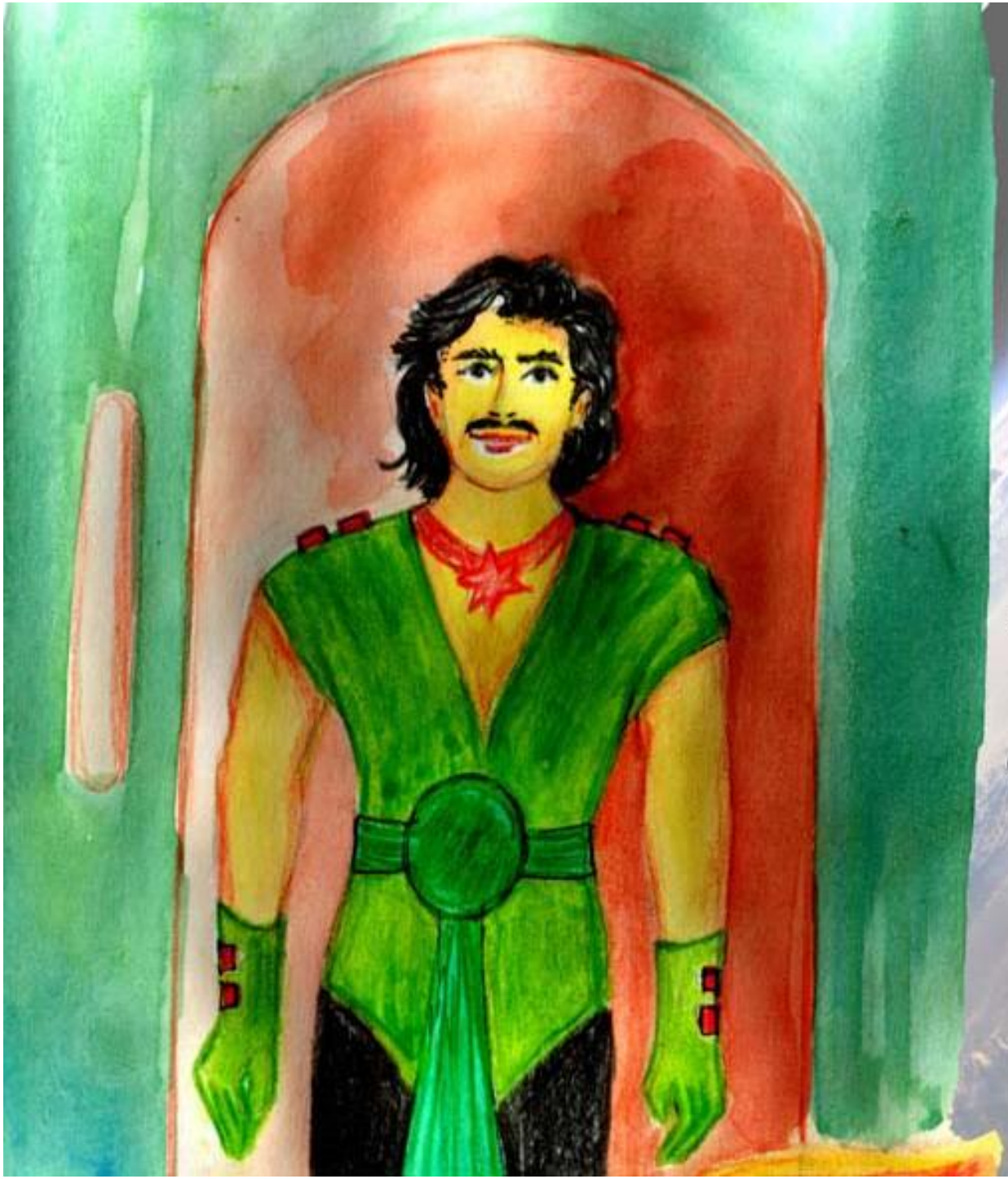

যন্ত্রমাসীর শব্দ পেয়ে
থমকে গেল ভেলা
শরীর জুড়ে উঠল জেগে
হাজার রঙের খেলা
দরজা খুলে বেরিয়ে এলো
আকাশ জ্যাকেট গায়ে
রাজপুত্র। অ্যান্টিগ্র্যাভের
জেট বাঁধা তার পায়ে।
বলল হেসে, 'হাজার যুগের
আকাশ পাড়ির শেষে
এ কোন গ্রহে এলাম আমি?
এ কোন তারার দেশে?'
'ক্যালিস গ্রহে সুস্বাগতম,
ওহে রাজার ছেলে'
বলল মাসী, 'এবার বলো
কোথার থেকে এলে?'

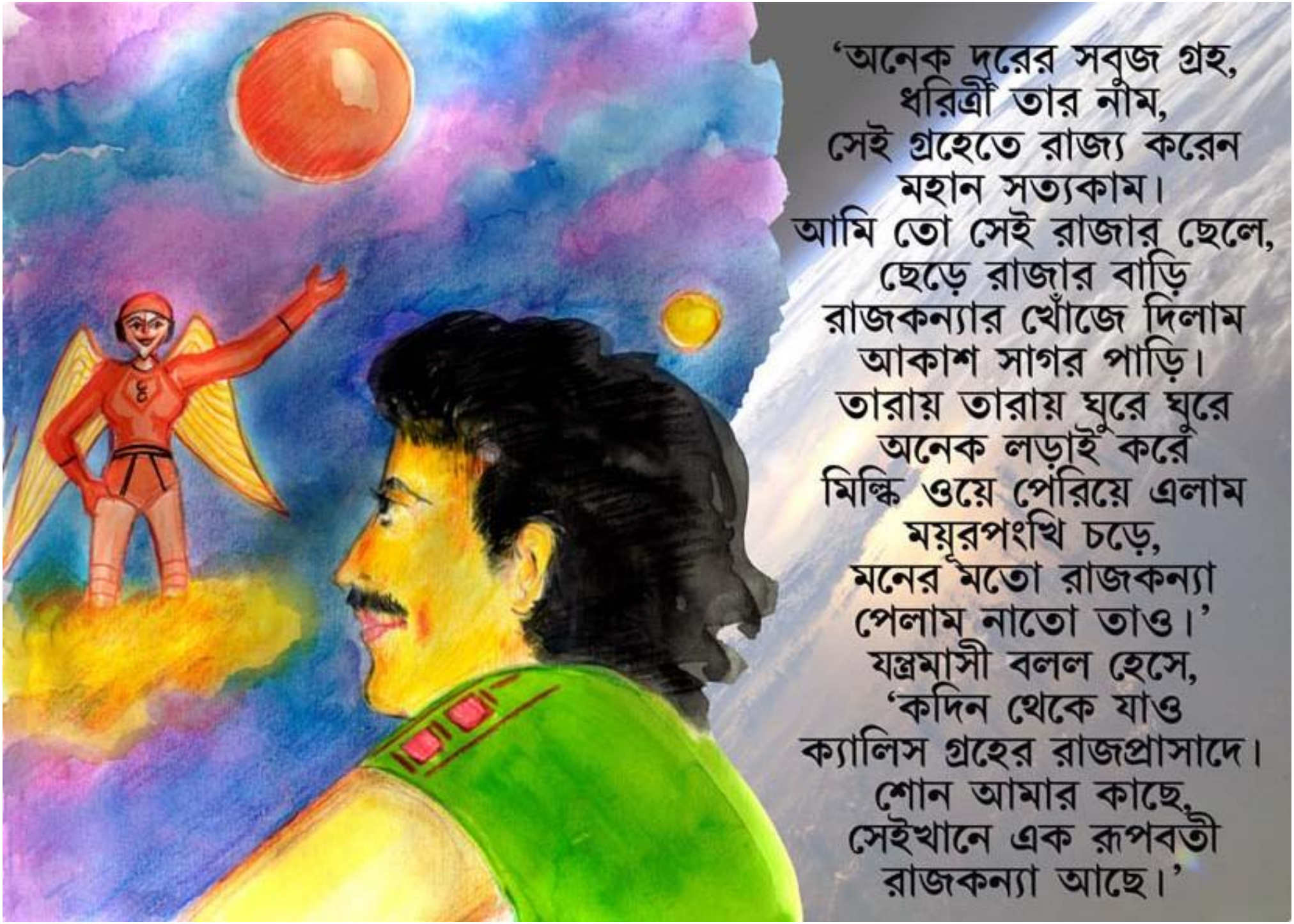
‘অনেক দূরের সবুজ গ্রহ,
ধরিত্রী তার নাম,
সেই গ্রহেতে রাজ্য করেন
মহান সত্যকাম।
আমি তো সেই রাজার ছেলে,
ছেড়ে রাজার বাড়ি
রাজকন্যার খোঁজে দিলাম
আকাশ সাগর পাড়ি।
তারায় তারায় ঘুরে ঘুরে
অনেক লড়াই করে
মিল্কি ওয়ে পেরিয়ে এলাম
ময়ূরপংখি চড়ে,
মনের মতো রাজকন্যা
পেলাম নাতো তাও।’
যন্ত্রমাসী বলল হেসে,
‘কদিন থেকে যাও
ক্যালিস গ্রহের রাজপ্রাসাদে।
শোন আমার কাছে,
সেইখানে এক রূপবতী
রাজকন্যা আছে।’

রাজপ্রাসাদের উঠোন জুড়ে
তখন দুপুরবেলা
আকাশ চিরে নেমে এলো
ময়ূরপংখি ভেলা।
বেরিয়ে এলেন রাজপুত্র
দরজাটি তার খুলে,
অমনি তাঁকে ভরিয়ে দিলো
সবাই ফুলে ফুলে।
উড়ল নিশান, বাজল সানাই,
সাজল বরণডালা
গলাতে তাঁর রাজকন্যা
পরিয়ে দিলেন মালা।

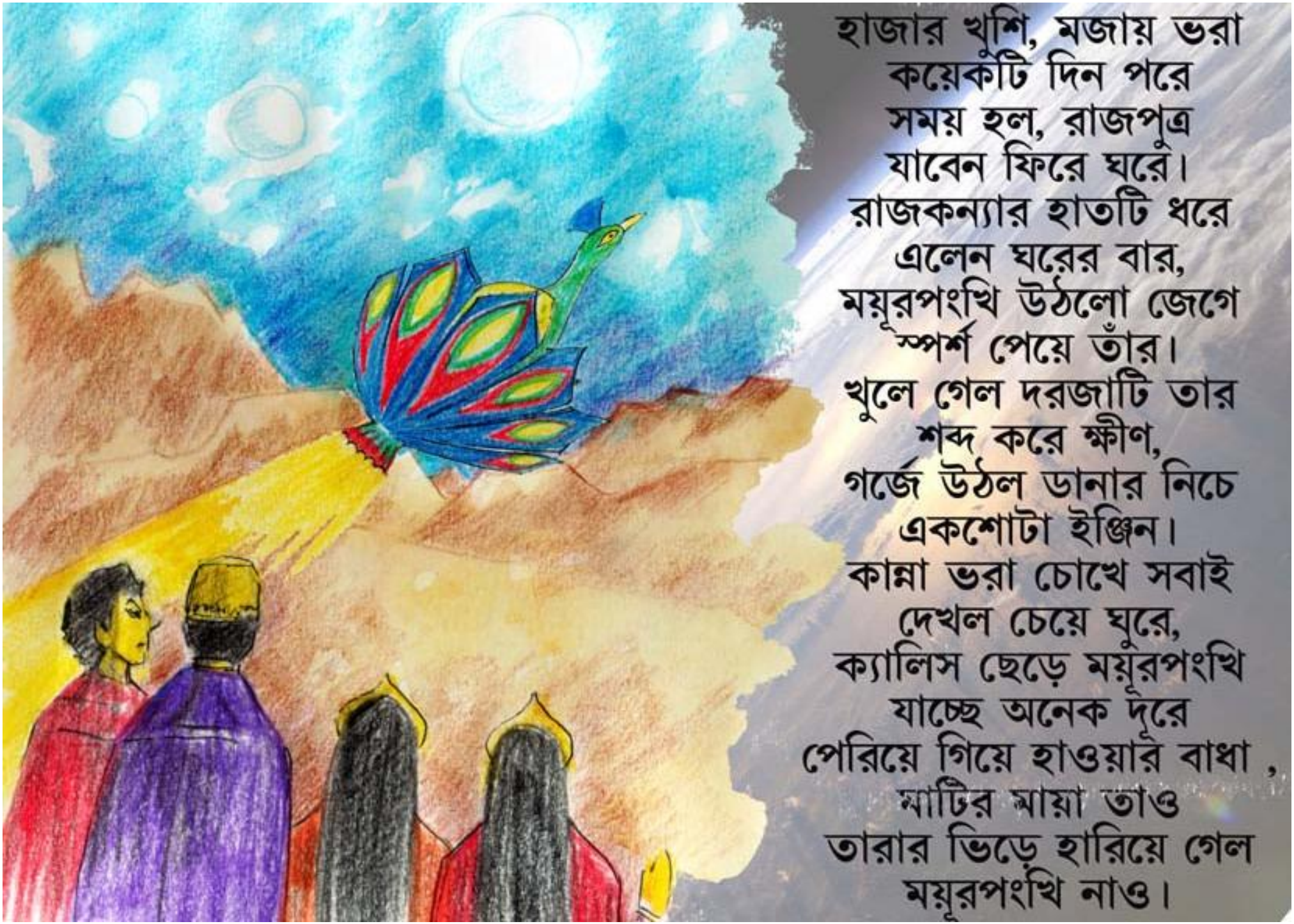
হাজার খুশি, মজায় ভরা
কয়েকটি দিন পরে
সময় হল, রাজপুত্র
যাবেন ফিরে ঘরে।
রাজকন্যার হাতটি ধরে
এলেন ঘরের বার,
ময়ূরপংখি উঠলো জেগে
স্পর্শ পেয়ে তাঁর।
খুলে গেল দরজাটি তার
শব্দ করে ক্ষীণ,
গর্জে উঠল ডানার নিচে
একশোটা ইঞ্জিন।
কান্না ভরা চোখে সবাই
দেখল চেয়ে ঘুরে,
ক্যালিস ছেড়ে ময়ূরপংখি
যাচ্ছে অনেক দূরে
পেরিয়ে গিয়ে হাওয়ার বাধা ,
মাটির মায়া তাও
তারার ভিড়ে হারিয়ে গেল
ময়ূরপংখি নাও।

বিচ্ছুর বুদ্ধি

শর্মিষ্ঠা খাঁ

সবে ঘুম আসি আসি করছিল। ভরদুপুরে অভদ্রের মত কলিং বেল বেজে উঠতেই গাটা রি রি করে জলে উঠল বিচ্ছুর। এই মুহূর্তে বাড়িতে শুধু সে ও ঠাম্মা। বাবা মা যথারীতি অফিসে। দু'দিন আগেই ঠাম্মুর চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে। তাই আজ বেরোনোর আগে বাবা বলে গেছে, 'দেখিস মামনি যেন বেশি হাঁটাচলা না করে। দরকার পড়লে হেল্প করবি। আর হ্যাঁ, এখন কদিন আমাদের অ্যাবসেন্সে বেল শুনে দরজা খোলার দায়িত্ব কিন্তু তোর।'

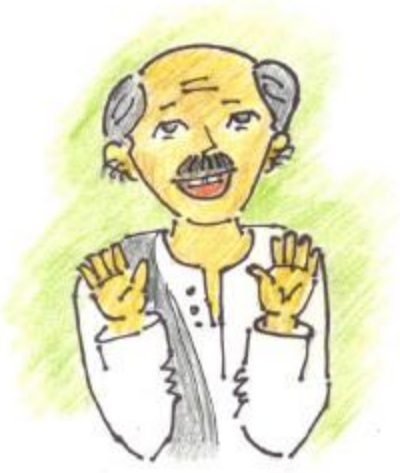

আই হোলে চোখ রেখে ভ্রু কুঁচকে গেল বিচ্ছুর। এ আবার কে রে বাবা! দুপুরবেলা অচেনা লোককে হুট করে ঘরে ঢুকতে দিতে বারণ করে মা। অথচ দরজার ওপারে লোকটা বেল বাজিয়েই চলেছে পরিত্রাহি। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে শোভাদেবীকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিল সে। ঠাম্মু নিজেই লোকটাকে ড্রয়িংরুমে ডেকে বসিয়েছে। অতএব দুষ্টু পচা কেউ নয় বলে আশ্বস্ত হল বিচ্ছু।

বহরমপুর থেকে এসেছেন গুরুভাই। আজকাল তো নিজে তেমন বেরোতে পারেন না! কেউ দেখা করতে এলে তাই মনটা বড়ো ভালো লাগে শোভাদেবীর। সত্যি কত যুগ পর দেখা! আপ্যায়ণ না করলে কি চলে? নাতিকে আড়ালে ডেকে বললেন,

'এই দাদুটা অনেকদিন পর এলো বুঝলি? চটপট একটা প্লেটে গোটা কয়েক মিষ্টি এনে দিবি লক্ষীসোনা আমার? আমি নিজেই আনতুম। জানিসই তো এই কালো চশমাটা পরে সব এমন আবছা দেখছি! ইস এই গরমটায় তেতেপুড়ে এসেছে গো! এক কাজ করিস। কী যেন বলিস তোরা, জুস না কী যেন নাম! ওটাও একটু এনে দিস দাদুকে কেমন?'

সামান্য দোষে বাবার হাতের চড় খেলেও বিচ্ছু ততটা ঘাবড়ায় না যতটা এখন ঘাবড়েছে! সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো অতিথির ওপর। কে বলেছিলো এই দুপুরবেলা লোকের বাড়ি আসতে? এখন কোথা থেকে যে মিষ্টি আর জুস নিয়ে আসবে? পাড়ার দোকানগুলো খুলতে খুলতে সেই বিকেল। কাল রাতে আর আজ দুপুরে শোবার আগে ফ্রিজের সব মিষ্টি সে খেয়ে ফাঁকা করে

রেখেছে! জুসও কি বসে আছে? এদিকে বেশি দেরি করলেও মুশকিল। ঠাম্মু সন্দেহ করবে। যা হোক এখনি কিছু একটা করতে হবে। নইলে রাতে বাবা-মায়ের ডুয়েট পারফরমেন্সের ঝড় সামলানো মহা মুশকিল!

উফ! ভাবতে ভাবতে কী একটা মনে পড়ে যেতেই চুলবুলে পায়ে পড়ার ঘরের দিকে ছুট লাগালো সে। মিষ্টির জোগাড় তার হয়ে গেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিষ্টির বন্দোবস্ত পাকা, এবারে করতে হবে জুসের ব্যবস্থা। সে-ও খুব সহজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। তার পর, ট্রে হাতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাজির বিচ্ছু। ঠাম্মু গর্বিত কন্ঠে আলাপ করিয়ে দিলো, 'মিত্রদা, এই আমার নাতি সুপ্ত। আসছে আশ্বিনে নয়ে পা দেবে।

'নে প্রনাম কর দাদুকে। আমার খুব যত্ন আত্তি করে জানেন তো! ছোটোবেলায় ভীষণ ডানপিটে ছিল। এখন কেমন বুঝদার হয়ে গেছে দেখুন?'

'গুরুদেবের কৃপায় এমন সুশীল নাতি পেয়েছেন দিদি।' দাদু মন খুলে আশীর্বাদ করলেন সুপ্তকে। ঠাকুমার হয়ে আজ অতিথি সেবা করছে বিচ্ছু! আনন্দে টইটম্বুর শোভাদেবী।

এই বয়েসে এতটা হাঁটাহাঁটি করে বেশ ভালোরকমই খিদে পেয়েছে ভদ্রলোকের। মহা আগ্রহে মিষ্টির থালা হাতে নিতেই কেমন থতমত খেয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

' এ যে ----------!!

তার পর সে এক মজার কাণ্ড। কিছুতেই মিষ্টি ছোঁবেন না তিনি, অথচ দিদি একটা হলেও খাইয়েই ছাড়বেন। এবার ঠাকুমার সঙ্গে অনুরোধ উপরোধে যোগ দিয়েছে নাতিও। অনেক কষ্টে হাই সুগারের মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে শেষে তিনি রক্ষে পেলেন।

তেষ্টাও পেয়েছে প্রবল। উল্টোদিকের চেয়ার থেকে বারংবার ভেসে আসছে আন্তরিক মিনতি, 'ঠান্ডাটুকু অন্তত খান দাদা!'

তুলে নিলেন গেলাস। সরবত ঠোঁট ডিঙিয়ে জিভে পৌঁছোতেই সাংঘাতিক একটা বিষম খেলেন তিনি। পাত্র চলকে পানীয় ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। বিচ্ছু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে নতুন দাদুটিকে সাহায্য করতে। এমনকি নিজে হাতে পরিষ্কার করেছে সোফার কুশন মেঝের কার্পেট।

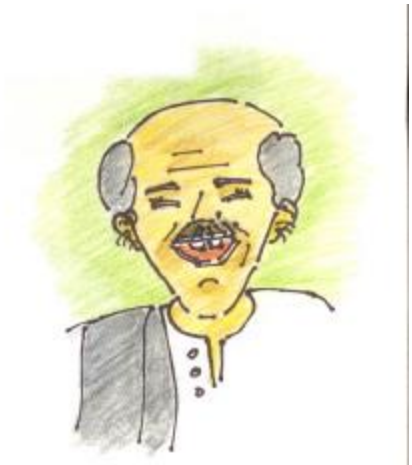

ওদিকে বিষম খাবার পর থেকেই মিত্রদা কেন যে উচ্চস্বরে হেসেই চলেছেন, বুঝে উঠতে পারলেন না শোভাদেবী।

'আহা রে দাদার মাথাটা গেছে দেখছি।' বৃদ্ধ বিদায় নিলে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাম্মু প্রবেশ করলো ঠাকুরঘরে।

সন্ধেবেলা আঁকার ক্লাস থেকে ফিরে শেষ অবধি বাবা মায়ের যুগলবন্দি এড়ানো গেল না। তবে পার্থক্য এখানেই, বিরাশি সিক্কার চড়ের বদলে আজ জুটেছে অনেক আদর। বোঝাই গেলো বাড়িতে

ঢুকতেই শাশুড়ির মুখে ছেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে আপ্লুত মা মহুয়াও। ফিক করে হেসে ফেলল বিচ্ছু। ঠাম্মুর কালো চশমাটা এবারের মত বড্ডো বাঁচা বাঁচিয়ে দিয়েছে। বেচারা বুড়ো দাদু আর সে বাদে কেউ কোনোদিন জানবে না যে আজ প্লেট ভরে সাজানো ছিল মেলা থেকে কেনা মাটির মিষ্টি। আর গ্লাসে মেশানো কমলা কালার কিউবের বাকিটা দিয়ে একটু আগেই সে ড্রয়িং স্কুলে এঁকেছে একটা সুন্দর বিকেল।

ছবি: সোমা

দুষ্টু বন্ধু

সুমনকুমার নায়েক

কাল থেকে দিব্যর সঙ্গে আমার কথা নেই জান তো? ঝগড়া হয়েছে। বরাবরই আমরা ফার্স্ট বেঞ্চে পাশাপাশি বসি। আজ বসিনি। সোজা লাস্ট বেঞ্চে চলে এসেছি। ওর পাশে বসতে আমার বয়েই গেছে!

আচ্ছা তোমরাই বলো, কার না রাগ হয়! আমাদের ক্লাসে একজন নতুন মিস্ এসেছে। যা সুন্দর ছবি আঁকে না তোমরা তো জানই না! প্রজাপতির মতো সারা ক্লাসরুম ঘুরে ঘুরে আমাদের যখন ছবি আঁকা শেখায়, কী মিষ্টি যে লাগে দেখতে--- আমার ড্রয়িং বুকে জাদুকাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পরিটার মতো! কালকে আমাদের হাউস আঁকা শেখাচ্ছিল। দিব্য আর আমি কিছুতেই পারছিলাম না। লাইনগুলো কেবলই বেঁকে যাচ্ছিল। মিস্ আমার খাতাটা নিয়ে যাবে, তার আগেই দিব্য ওরটা দিয়ে দিয়েছিল। নিজের হাতে মিস্ সেখানে হাউস এঁকে দিল। আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল।

মিস্ চলে যেতেই ওর খাতাটা ধরে বললাম, 'মিস্ আমার খাতা নিতে যাচ্ছিল তুই দিলি কেন? এ ছবিটা আমার, সে আমাকে---'

'না, আমার খাতায় এঁকেছে, এটা আমার,' কথাটা বলেই দিব্য এমন জোরে টান মারল যে ছবিটাই ছিঁড়ে গেল মাঝবরাবর। আর তাতেই হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিল দিব্য। আচ্ছা তোমরাই বলো--- এতে আমার কী দোষ!

ততক্ষণে শিখা মিস্ চলে এসেছে ক্লাসে। আমাকে কী বকাই না বকল,এমনকি হাই বেঞ্চে দাঁড় করিয়েও রাখল কান ধরে। গোটা ক্লাস হো-হো করে হাসছিল। জানো, এমনকি দিব্যও! তখন কী ভীষণ যে কষ্ট হচ্ছিল আমার! জল চলে এসেছিল চোখে----

টিফিন চলছে। সবাই খেলা করছে। আমি করিনি। ভালো লাগছে না। দিব্য দূর থেকে আমায় আড়চোখে দেখছিল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। বাগানের ইউক্যালিপটাস গাছটার সরু ডালে একটা পাখি দোল খাচ্ছে, আর থেকে থেকেই কিটকিট করে শব্দ করছে ঠোঁটে। আমি সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ পেছন থেকে সৌম্যজিৎ এসে পড়ল গায়ের ওপর। সৌম্য আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে বদমাস ছেলে। ইয়া মোটা। একদম পড়াশোনা করে না। গায়ে পড়ে সবার সঙ্গে কেবল ঝগড়া মারামারি করে।

আমি কিছু বলার আগেই ও গুণ্ডাদের মতো চোখ করে বলল, 'কী রে সরতে পারছিস না, দেখছিস না আমি আসছি।'

কোনও কথা না বাড়িয়ে একটু সরে দাঁড়ালাম। নবাবি স্টাইলে ও একটা হাত পকেটে আর একটা হাত আমার কাঁধে রেখে হাসতে হাসতে বলল,

‘শুনলাম, তোর সঙ্গে দিব্যর নাকি ঝগড়া হয়েছে! যাক ভালোই হয়েছে----শোন, আজ থেকে তুই আমাকে বস্ বলে ডাকবি কেমন?--- ওই দেখ বিটু যাচ্ছে, ওকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আয়--- যা---’

আমার রাগ ততক্ষণে মাথায় উঠে এসেছে। কাঁধ থেকে ওর হাতটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, ‘একদম বাজে কথা বলবি না, সৌম্য।আমি তোর চাকর নই। যা ভাগ এখান থেকে---’

----‘আরিব্বাস! মুখে খই ফুটছে রে---’বলতে বলতেই জোরে আমাকে একটা ধাক্কা দিল সৌম্য। আর একটু হলেই আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতাম বারান্দা থেকে, খুব সামলে নিয়েছি। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি--- কোথা থেকে দিব্য ছুটে এসে সৌম্যর জামা খামচে ধরেছে। সৌম্য ওকে দেওয়ালে ঠেসে ধরার আগেই ও ক্যারাটের কায়দায় পায়ে ল্যাং

মেরে মাটিতে হঠাৎ ফেলে দিল সৌম্যকে। তারপর ওর বুকের ওপর চেপে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে চালাতে চিৎকার করতে লাগল, ‘তোকে মেরেই ফেলব, আর কোনওদিন যদি সুমনকে জালাতন করিস-।

বেচারা সৌম্যর তখন নড়াচোড়ার ক্ষমতাও নেই, খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আমি দিব্যর হাত চেপে ধরে বললাম, ‘ছাড় দিব্য, ছেড়ে দে, আর মারিস না---’

ছাড়া পেয়ে সৌম্য ‘তোকে পরে দেখে নেব’ বলে শাসাতে শাসাতে চলে গেল। দিব্যর হাত তখনও মুঠো করা, রাগে ফুঁসছে। দেওয়ালে ঘসা লেগে ওর কনুইয়ের কাছটা ছিঁড়ে গেছ। সে’দিকে কোনও হুঁশই নেই ওর।

বললাম, ‘ওই গুন্ডাটার সঙ্গে মারপিট করতে যাচ্ছিস কেন!’

দিব্য অবাক হয়ে বলল, ‘বা রে! ও শুধু শুধু তোকে যা খুশি তাই করে যাবে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব!’

বললাম, ‘তোর কনুইয়ের কাছটা ছিঁড়ে গেছে, লাগছে না?’

‘দুর ছাড়তো। আয় আমার সঙ্গে---’

হাত ধরে টানতে টানতে আমায় ক্লাসে নিয়ে এল দিব্য। তারপর আমার ব্যাগটা ওর পাশে রেখে দিয়ে ঝলমল করে হেসে উঠল। ওর দু’চোখে তখন গাঢ় সবুজ একটা বন্ধুত্ব তিরতির করে কাঁপছে---ঠিক ইউক্যালিপটাস গাছে দোল খাওয়া সেই পাখিটার মতো!

ছবি সৌভিক

অনুবাদ গল্প

অমরগাথা

অমিত দেবনাথ

'আমি বিখ্যাত মৃত ব্যক্তিদের আত্মা আনতে পারি,' বললেন ড: ফিনিস ওয়েলস।

তিনি একটু নেশার ঘোরে ছিলেন, না হলে হয়তো এটা বলতেন না। অবশ্য বার্ষিক ক্রিসমাস পর্টিতে একটু আধটু নেশা করাই যায়।

স্কুলের তরুণ ইংলিশ টিচার স্কট রবার্টসন তার চশমাটা ঠিকঠাক করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ তাদের কথা শুনছে কি না। তারপর বলল, 'বলেন কি, ডক্টর?'

'তবে আর বলছি কী?', বললেন ডক্টর ওয়েলস, তবে শুধু ছায়া ছায়া আত্মা হিসেবে নয়, তাদের সশরীরেই আনতে পারি।'

'তা কী করে সমভব, ডক্টর?' বলল রবার্টসন।

'কেন সমভব নয়? সময়টকে পাল্টে নিলেই হল।'

'আপনি কি টাইম ট্রাভেলের কথা বলছেন? সময় ভ্রমণ? কিন্তু ইয়ে সেটা কি বাস্তবে সমভব?'

'সমভব, যদি তুমি পদ্ধতিটা জান।'

'কী করে ডক্টর?'

'তুমি কি ভাবছ তোমাকে আমি পদ্ধতিটা জানিয়ে দেব?' গমভীরভাবে বললেন পদার্থবিদ ড: ফিনিস ওয়েলস। এদিক ওদিক তাকালেন যদি আরেক পাত্তর পানীয় পাওয়া যায়। যদিও এই মুহূর্তে সেটা পাওয়া গেল না। 'আমি বেশ কিছু সুবিখ্যাত লোককে এনেছিলাম। আর্কিমিডিস, নিউটন, গ্যালিলিও। আহা বেচারারা ------'

'কেন? বেচারা বললেন কেন? আমার তো মনে হয়, ওরা এই সময়ে এলে এখনকার বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে খুশিই হতেন', বলল রবার্টসন। কথাবার্তা চালাতে তার খারাপ লাগছিল না।

'হতেন মানে? হয়েছিলেন তো। বিশেষত আর্কিমিডিস। তাঁর তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড় হয়েছিল, যখন তাঁকে আমি কিছু কিছু জিনিস গ্রিকে শোনাচ্ছিলাম, কিন্তু ---- কিন্তু -----'

'কিন্তু কী ডক্টর?'

'আর কী, ওই কালচারাল ডিফারেন্স। সংস্কৃতির তফাৎ । আমাদের এখনকার জীবনযাত্রার সাথে তাঁরা খাপ খাওয়াতে পারলেন না। ওঁরা এক্কেবারে নি:সঙ্গ বোধ করছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন। কী আর করব, তাঁদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা খারাপ হল।'

'হলই তো। বিশাল মাপের মানুষ ওরা, কিন্তু মনটাকে এখনকার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তখন কী আর করব, আরেকজনকে আনলাম।'

'কাকে?'

'শেক্সপিয়ারকে।'

'কী?' এত জোরে চেঁচাল রবার্টসন যে মনে হল সেই আওয়াজ তার বাড়ি অবধি পৌঁছে যাবে।

'চেঁচিও না, খোকা', বললেন ওয়েলস, ' ওটা বিচ্ছিরি স্বভাব।'

'আপনি বলতে চান আপনি শেক্সপিয়ারকে এনেছিলেন?'

‘এনেছিলাম বইকি। আমি এমন একজনকে চাইছিলাম যাঁর মনটা হবে দরাজ, খোলামেলা, এমন একজন যিনি তার নিজস্ব সময়ের অনেক পরের সময়ের, কয়েক শো বছর পরের মানুষের মনও একইরকমভাবে বুঝতে পারবেন। এক্ষেত্রে শেক্সপিয়ার হলেন এক্কেবারে ঠিক ব্যক্তি। আমি তাঁর সইও নিয়েছি। অটোগ্রাফ। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। বুঝতেই পারছ।’

‘আপনার কাছে আছে ওটা?’ অবিশ্বাসী গলায় বলল রবার্টসন।

‘দেখবে?’ ওয়েলস পকেট হাতড়তে লাগলেন।‘কোথায় যেন? এই যে, পেয়েছি।’

ছোট্ট একটা পেস্টবোর্ডের টুকরো তিনি এগিয়ে দিলেন রবার্টসনের দিকে। যার একপাশে ছাপানো আছে, ‘এল ক্লেইন এন্ড সন্স, হোলসেল হার্ডওয়ার।’ অন্যপিঠে কাঁপা হাতে লেখা, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।’

কেমন যেন সন্দেহ হল রবার্টসনের। ‘ওঁকে কেমন দেখতে বলুন তো?’

‘একেবারেই তাঁর ছবির মতো নয়। টাকমাথা, বিচ্ছিরি গোঁফ। উচ্চারণও যেন কেমন কেমন। তবে আমি তাঁকে আমার সময়ে খুশি রাখার জন্য যথাসাধ্য করেছি। আমি তাঁকে বলেছি আমরা এখনও তাঁর নাটক পড়ি, মঞ্চে অভিনীত হয়। আমি তাঁকে এও বলেছি যে, তাঁর লেখা, ইংরেজি সাহিত্যে তো বটেই, যে কোনো ভাষাতেই সর্বোত্তম।’

‘বা বা।’ এক নি:শ্বাসে বলল রবার্টসন।

‘আমি তাঁকে বললাম যে লোকজন তাঁর নাটকের ওপর গাদা গাদা বই লিখেছে। তিনি একটা দেখতে চাইলেন, আমি লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে এসে তাঁকে দেখালাম।’

‘তারপর?’

‘তিনি যে কি খুশি হলেন, ভাবতে পারবে না। অবশ্য তাঁর একটু অসুবিধে হচ্ছিল এখনকার ভাষাটাষাগুলো পড়তে। হাজার হোক, ১৬০০ শতকের ভাষা আর এখনকার ভাষায় অনেক তফাৎ হয়ে গেছে তো! তাঁর জন্য দু:খ হয়। তিনি বলছিলেন,‘ হে ভগবান, এত বছরেও ভাষার কোনো উন্নতি হল না! লেখার মধ্যে সেই সাবলীলতা কোথায়?’

‘তিনি একথা বলতেই পারেন না।’

‘কেন পারেন না? তিনি কত দ্রুতগতিতে লিখতেন তুমি জান? তিনি বলছিলেন এজন্য তাঁর সময় ভাগ করা থাকত। তিনি হ্যমলেট লিখেছিলেন ছমাসেরও কম সময়ে। প্লটটা অনেক পুরোনো, তিনি সেটাকেই আরো সাজিয়ে গুছিয়ে লিখেছিলেন।’

‘তখনকার লোকেরা তো তাই করত। সবই যেন টেলিস্কোপের কাচ, খালি পালিশ করে যাও, পালিশ করে যাও।’ বিরক্তভাবে বলল ইংরেজির শিক্ষক।

ডক্টর থামিয়ে দিলেন তাকে। বারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি একপাত্র পানীয়ের জন্যে। তারপর বললেন, ‘আমি তাঁকে তাঁরই লেখা একটা অমরগাথা শোনালাম, যেগুলো আমরা কলেজ কোর্সেও রেখেছি।’

‘আমার ক্লাসেও রেখেছি একটা।’

‘আমি জানি। সে জন্যেই তো আমি তোমার সান্ধ্য ক্লাসে তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। আমি কখনো কোন লোককে তার সমপর্কে তারই উত্তরপুরুষেরা কী ভাবছে তাই নিয়ে এত উদগ্রীব হতে দেখিনি। তিনি বেশ খাটছিলেনও।’

‘আপনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে আমার ক্লাসে ভর্তি করিয়েছিলেন?’ বিড়বিড় করে বললেন রবার্টসন। নেশার ঘোরে সে ঠিক শুনছে তো? নাকি নেশার ঘোরে নয়? তার একটু একটু মনে পড়ছিল যেন, একটা টাকমাথা

লোক সত্যি সত্যিই ছিল তার ক্লাসে, উচ্চরণটা অদ্ভুত ধরণের -----

‘অবশ্য তার আসল নামে নয়, বুঝতেই পারছ,’ বললেন ড: ওয়েলস। ‘নামে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হল, ভুল হয়েছিল। ভুল হয়েছিল ভর্তি করানোটা। বিরাট ভুল। বেচারা ------’ পানীয়তে এক চুমুক মেরে আক্ষেপে মাথা নাড়লেন তিনি।

‘ভুল হয়েছিল? কীসের ভুল?’

‘আমি তাঁকে আবার ১৬০০ শতাব্দীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।’ খিটখিটে গলায় বললেন ডক্টর ওয়েলস।‘একজন লোক আর কত অসম্মান সহ্য করতে পারে?’

‘অসম্মান? কীসের অসম্মানের কথা বলছেন আপনি?’

ড: ওয়েলস গ্লাসের বাকী পানীয়টা শেষ করলেন। ‘এখনো বুঝতে পারছ না মূর্খ? তুমি তাকে ফেল করিয়ে দিয়েছ!’

(আইজ্যাক আসিমভের ‘দি ইমমর্টাল বারড’ অবলম্বনে)

ছবি: দীপংকর

সবুজ সবুজ আলো

গার্গী ভট্টাচার্য

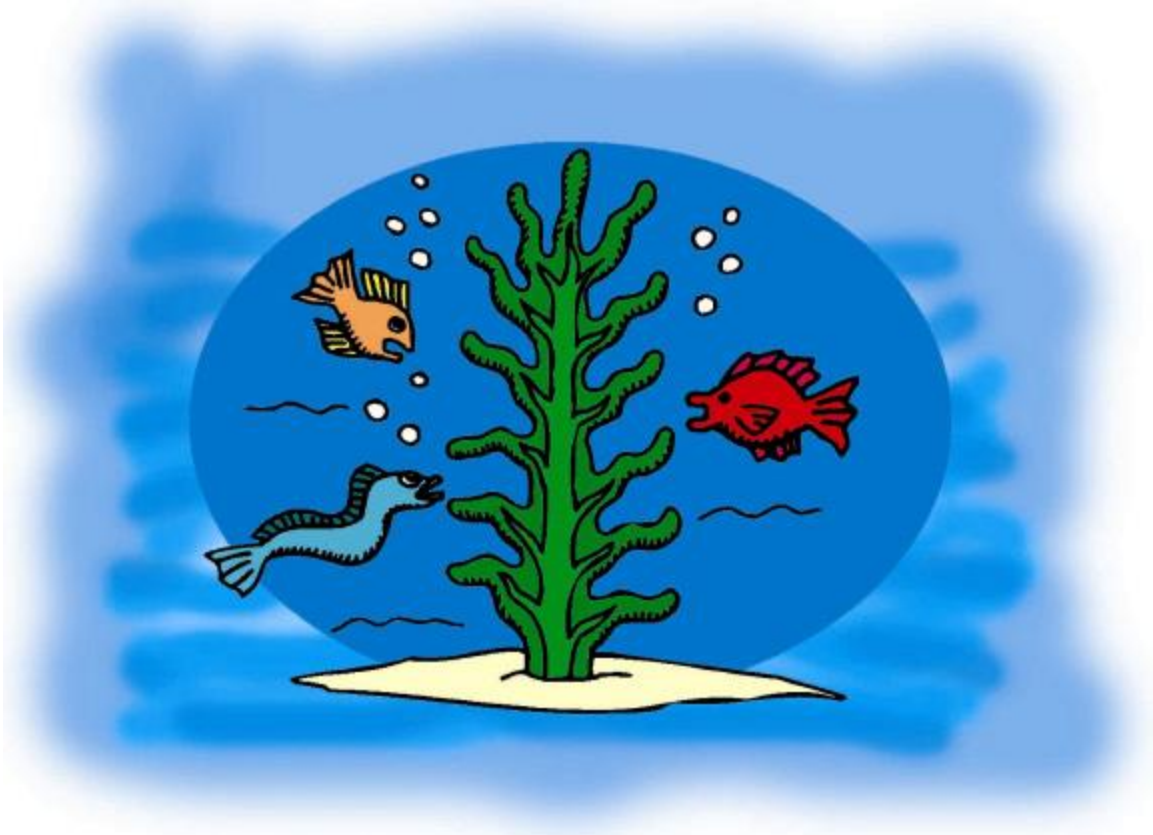

ছোট্ট রাস্কিন। সোনালী চুল, নীল চোখ। গা থেকে বার হয় সবুজ সবুজ আলো। রাস্কিন বেড়াতে খুব ভালবাসে। ছোট্ট দুটো হাতে মাকে জাপটে ধরে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে, চাঁদে, সূর্যে তারায় তারায়। একদিন সকালে রাস্কিন বা ছোট্ট র‍্যাস একা একা বেড়াতে চলে গেলো নদীর পাড়ে। সেখানে আছে মাছেদের থাকার মাছঘর। বড় বড় মাছ যারা র‍্যাসের থেকেও অনেক বড় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। ছোট্ট মাছ, যার নাম টুরটুরা সে র‍্যাসকে কথা দিলো একদিন নিয়ে যাবে মাছেদের বাড়ি। জলের গভীরে।

একদিন সকালে খুব শীত ছিলো। হাওয়া গায়ে ফুটে যাচ্ছিলো। র‍্যাসের বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করছিলো না। অথচ টুরটুরাকে কথা দেওয়া ছিলো। মোবাইলে একটা কল করল টুরটুরাকে। ও হ্যাঁ, বলা হয়নি। টুরটুরা এক ধরণের মোবাইল ব্যবহার করে, যা ঝিনুক দিয়ে তৈরি। চকচকে এক মোবাইল যা জলেও চলে। ওদের মোবাইল ভেজা ভেজা হয়। রিং করলে ঢেউএর আওয়াজ হয়।

র‍্যাস জানিয়ে দিলো সে যাবেনা। তবুও টুরটুরা , যাকে ও টুর্স বলে ডাকে, বায়না ধরলো, আসতেই হবে।

কী করে যাবে র‍্যাস ? এই বৃষ্টির টাপুর টুপুরের মধ্যে ? টুর্স না হয় ভেজেনা। কিন্তু র‍্যাস?

টুর্সই বুদ্ধিটা দিলো। বললো , বাথরুমের শাওয়ারের নিচে চলে এসো, তারপর দেখো খেল।

র‍্যাস সেখানে যেতেই টুর্সের মতো এক নীল মাছ এসে র‍্যাসকে টেনে ধরে ঝর্ণা বেয়ে নিয়ে গেলো নদীতে। তারপরে, আয়নার মতন জলরাশি পেরিয়ে গভীর জলে মাছের দেশে। লাল, নীল,সবুজ, সোনালী মাছেরা ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। কেউ কেউ খেলছে। মোবাইল হাতে ব্যস্ত টুরটুরা।

মাছের বসার ঘরে অনেক ঝিনুক। এক একটা এত সুন্দর যে র‍্যাস চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। মাঝে মাঝে ঝিনুকগুলো উড়ে উড়ে জায়গা বদল করছে। একটা ভাঙা জাহাজ পড়ে আছে দূরে। সেখানে মাছেদের সভা বসেছে। চলছে জরুরি মিটিং। মৎস্যকন্যা ওদের রানি। অপরূপ সেজে বসে আছেন। মৎস্যকন্যা বানিয়েছেন কেক। অক্টোপাসের কেক। ওপরে সুন্দর সুন্দর জলজ আঙুর সাজানো। রূপোর কুঁচির মতন এই আঙুর শুধু জলেই হয়। হাত বাড়িয়ে একটা নিয়ে র‍্যাস খেয়ে দেখলো। অপূর্ব স্বাদ। মন ভরে গেলো। আরো খাবার বাসনায় হাত বাড়াতোই টুর্স না করলো। বললো, বেশি খেলে ও-ও মাছ হয়ে যেতে পারে। তা হয়ে যাক না মাছ। মন্দ কী? ও তো মাছ হতেই চায়। এত্তো সুন্দর দেশে থাকতে পারবে। স্কুলে যেতে হবেনা। মায়ের বকুনি হোমওয়ার্ক! উহ্ কেন যে টুরটুরা বুঝতে পারছেনা!

হঠাৎ দেখলো ওর মৃত দাদুকে। টুরটুরার সঙ্গে গপ্‌পো করতে করতে এদিকেই আসছেন! চমকে ইঠলো র‍্যাস! দাদু ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। মারা যাবার পরে র‍্যাস শুনেছিলো উনি স্বর্গে গেছেন ! কিন্তু দাদু এখানে! লোকে যে কত কী ভুলভাল বলে, না জেনেই! এই দেখোনা, বলে, পৃথিবীটা খুব সুন্দর। কই? তার চেয়েও তো ভালো এই মাছেদের দেশ। কী সুন্দর!

দাদু এসে ওকে অনেক আদর করলেন। মনটা ঠান্ডা হল, খুশি হলো। কিন্তু মোবাইল নম্বরটা দিলেন না। বললেন, এই মোবাইল তোমার ওখানে চলেনা।

--কিন্তু টুরটুরারটা তো চলে।

--হ্যাঁ, কারণ ও মাছ আর আমি এখানে ভিনদেশি। বলেই দাদু হাসলেন। করুণ সুরে বললেন, এখানে মানুষ আসতে পারেনা।

--তাহলে আমি কী করে এলাম? র‍্যাস জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় দাদুর দিকে।

--কারণ তোমার গা থেকে সবুজ সবুজ আলো বার হয়। তাই তুমি আসতে পেরেছো। সবাই পারেনা।

র‍্যাস চুপ করে শোনে। জানতে পারে দাদু স্টিং রে ফিশের চাবুকের মতন ল্যাজ থেকে বিদ্যুৎ বের করে মাছেদের রাজ্যের সমস্ত যন্ত্রপাতি চালান। দাদু ছিলেন ফিজিসিস্ট , তাই জন্যে।

দাদু চলে গেলেন কাজে। এল হাঙর। ওর দাঁতগুলো ধরে দেখতে বললো টুর্স। র‍্যাস দেখলো। প্রথমে ভয় করছিলো। কিন্তু ভয় কেটে গেলো পরে। ভালই হল। দেখলো ওর এক একটি দাঁত এক একটি আইসক্রিমের কাপ। কী সুন্দর খেতে। টুর্স বললো, মানুষ ওকে ভয় পায়। কিন্তু ওর দাঁত আসলে আইসক্রিম! সত্যি খেতেও ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতন। হাঙরের গলার স্বর কেমন মিকি মাউসের মতন। দেখে মনেই হয়না ওর দেহটা এত্তো বড়!

খুব ভালো লাগছিলো র‍্যাসের। এখানেই যদি থেকে যেতে পারত! কিন্তু টুর্স বললো যে ওকে বিকেলের আগেই চলে যেতে হবে, নাহলে ওর দেহ গলতে আর করবে। তাই ওকে চলে যেতে হল। ফেরার সময় একটি বোটে তুলে দিলো টুর্স। তাতে করে ডাঙায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু নৌকার মাঝি ওকে মারছিলো। একা কাউকে না বলে কোথায় চলে গেছে বলে বকছিলো। একটুও ভালো লাগছিলো না র‍্যাসের। শেষে ওকে পাড়ে নামিয়ে দিতেই মা-বাবা--গ্র্যানি এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে কোলে তুলে নিলো। মা চুমুতে-চুমুতে ওকে ভরিয়ে দিলো। গ্র্যানি ওকে আদর করলো বটে, তবে বকলো-ও। কিন্তু ও যখন বললো যে দাদু ওখানেই থাকেন, ওরা সবাই চুপ করে গেলো। দাদুর কথা জানতে চাইছিলো সব্বাই। দাদু কেমন আছেন। ও বললো, মাছেরা খুব ভালো। হাঙর ভালো, কিন্তু মাঝি খুব দুষ্টু। ওকে মারে, বকে। মানুষ কেন স্বজাতির সঙ্গে এরকম করে?

তাই না শুনে গ্র্যানি বললেন, ও তুমি বুঝবে না সোনা, চলো এখন ঘুমাবে।

শুইয়ে দিলো ওকে। নরম বিছানায়। ফুলের পাপড়ি ছড়ানো ওর চারদিকে। মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। হয়তো গোলাপের কিম্বা পারিজাতের।

হঠাৎ কে যেন বললো,ওটা ক্লোরোফর্মের গন্ধ!

চোখটা খুলতেই দেখলো ও শুয়ে আছে হাসপাতালের বেডে। পাশে একজন মহিলা। মনে হয় ওর মা। গায়ের গন্ধটা চেনা চেনা লাগছে।

কে যেন ওকে একটা লকেট পরিয়ে দিয়ে গেলো। বললো, আজ থেকে ওর নাম মারিয়া। বাবা-মা ভেবেছিলেন ছেলে হবে, তাই নাম ঠিক করেছিলেন রাস্কিন। আসলে ও মেয়ে,আর ও আজকেই এই দুনিয়ায় প্রথম পা দিলো। স্বপ্নময় চোখদুটি মেলে মারিয়া দেখতে লাগলো অচেনা ভুবন।

টুরটুরার দেশ কিম্বা র‍্যাসের বাড়ি থেকে যা অনেক অনেক আলাদা।

ছবি: সৌভিক

মেঘের বাড়ি মেঘালয়ে ভ্রমণের তৃতীয় ও শেষপর্ব এই সংখ্যায়

চেরাপুঞ্জিতে বনবিভাগের তৈরি থাংখারাং পার্ক দেখলাম। এই পার্কের এক প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের সমতলভূমির এক ঝলক দেখা গেল। সিলেট জেলার ছাতোক শহর। এই জায়গা থেকে ভারতের সীমান্তে 'সেলা' নামক জায়গা কাছেই। সেখানে 'বর্ডার হাট' বসে। দুপক্ষের মিলিত হাটে দু দেশের লোকেরা বি এস এফ এবং বাংলাদেশ রাইফেলের সম্মতি নিয়ে কেনাবেচা করে থাকে। খাসি উপজাতির লোকেরা মেঘালয় থেকে কলা, পান, সুপুরি, কমলালেবু, কাঁঠাল ইত্যাদি নিয়ে যায়। আর বাংলাদেশ থেকে মাছ নিয়ে আসে।

এই পার্কের ইনচার্জ রেঞ্জ অফিসার স্থানীয় খাসি উপজাতির লোক। তিনি এই পার্কের সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন। থাংখারাং শব্দটির মানে হল শুকনো মাছ। অবিভক্ত ভারতে পূর্ববঙ্গ ও মেঘালয়ের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চলত। তখন ছাতোকের বাজার থেকে মাছ কিনে আদিবাসীদের মেঘালয় ফেরৎ আসার পথে এই পার্কে পৌঁছুতে রাত্রি হয়ে যেত। তখন তাঁরা এখানে পৌঁছে সঙ্গের মাছ আগুনে পুড়িয়ে শুকিয়ে নিতেন যাতে তা খারাপ হয়ে না যায়। সেই জন্য এই জায়গার নাম শুকনো মাছ বা থাংখারাং হয়েছে।

এইখানে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর চেরাপুঞ্জির রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী সুবোধানন্দজির সঙ্গে দেখা করলাম। মিশন এই এলাকায় অসাধারণ কাজ করেছে। ১৯৩১ সাল থেকে রামকৃষ্ণ মিশন এখানে ইশকুল এবং সেবার কাজ চালাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে খাসি উপজাতির শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মিশনের অসামান্য অবদান রয়েছে। চেরাপুঞ্জির হায়ার সেকেণ্ডারি ইশকুল ছাড়াও মিশনের উপকেন্দ্র চলছে মেঘালয়ের আরও ন'টি জায়গায় এবং খাসি উপজাতির মধ্যে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দেবার কাজে আসাধারণভাবে সফল হয়েছে।

সুবোধানন্দজি জানালেন সে সপ্তাহে তিনি মিশনের কাজ তাঁর উত্তরসূরীকে বুঝিয়ে দিয়ে বেলুড় মঠে ফিরে যাবেন। তিনি গত ত্রিশ বছর মিশনে থেকে সেবা করেছেন, তার মধ্যে পঁচিশ বছরই উত্তর-পূর্ব ভারতে। মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে চেরাপুঞ্জি থেকে ফেরৎ রওয়ানা হলাম।

চেরাপুঞ্জিতে প্রথম একঘন্টা ছেড়ে দিলে বাকি সময়টা প্রায় পুরোই বৃষ্টি পেলাম। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে বয়ে আসে। তারপর চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ওপরে উঠে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টিতে ছাতাও বিশেষ কাজে এল না। মে মাসের শুরুতেই এমন বৃষ্টি! জুন-জুলাইতে আরও বেশি বৃষ্টি হয়। বর্ষা চলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত।

ফেরার পথে পুরো রাস্তা মেঘে ঢাকা ছিল। ঘন মেঘের আস্তরণ ভেদ করে ফগ লাইটের সাহায্য নিয়ে দুপুর দুটোর সময়েও গাড়ি চালানো বেশ মুশকিল। রাস্তার মাঝখানের সাদা ডিভাইডার লাইন দেখে আস্তে আস্তে গাড়ি চলছিল। এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

এয়ারফোর্স মিউজিয়াম

শিলং-এ ফিরে ইস্টার্ন এয়ার কম্যান্ড-এর প্রধান দফতরে এয়ারফোর্স মিউজিয়াম দেখলাম। ভারতীয় বায়ুসেনার বিভিন্ন বীরগাথা ও সামরিক প্রস্তুতির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে এখানে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বোত্তর ভারতের সমস্ত এয়ার স্টেশনগুলো এই কম্যান্ডের অধীনে।

এরপর শিলং পিক। সেখান থেকে শিলং শহরের দৃশ্য খুব সুন্দর। এই জায়গার উচ্চতা ছ হাজার ফিট। এখানে খাসি মহিলারা দোকান সাজিয়ে বসে আছেন। কিছু কেনাকাটা হল।

খাসি সমাজের মাতৃকেন্দ্রিক জীবনধারার গল্প শুনলাম। সমপত্তি সব মায়ের নামে থাকে। ছেলেমেয়েদের পরিচয়েও মায়ের নাম জুড়তে হয়। মায়ের সমপত্তি শুধু মেয়েরা পায়। ছোট মেয়ে পায় একটু বেশি কারণ সে মা-বাবার সঙ্গে থেকে তাঁদের দেখাশোনা করে। বিয়ের পরে ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি যায় এবং সেখানেই সারাজীবন থাকে। বেশ অবাক লাগে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা এখন অনেক পাল্টে গেছে। ছেলেরাও এখন মেয়েদের সমান সমপত্তির দাবি করছে এবং সমান ভাগ পাচ্ছেও। মায়ের নামের জায়গায় বাবার নামও ছেলেমেয়েদের সরকারি রেকর্ডে দিতে হচ্ছে।

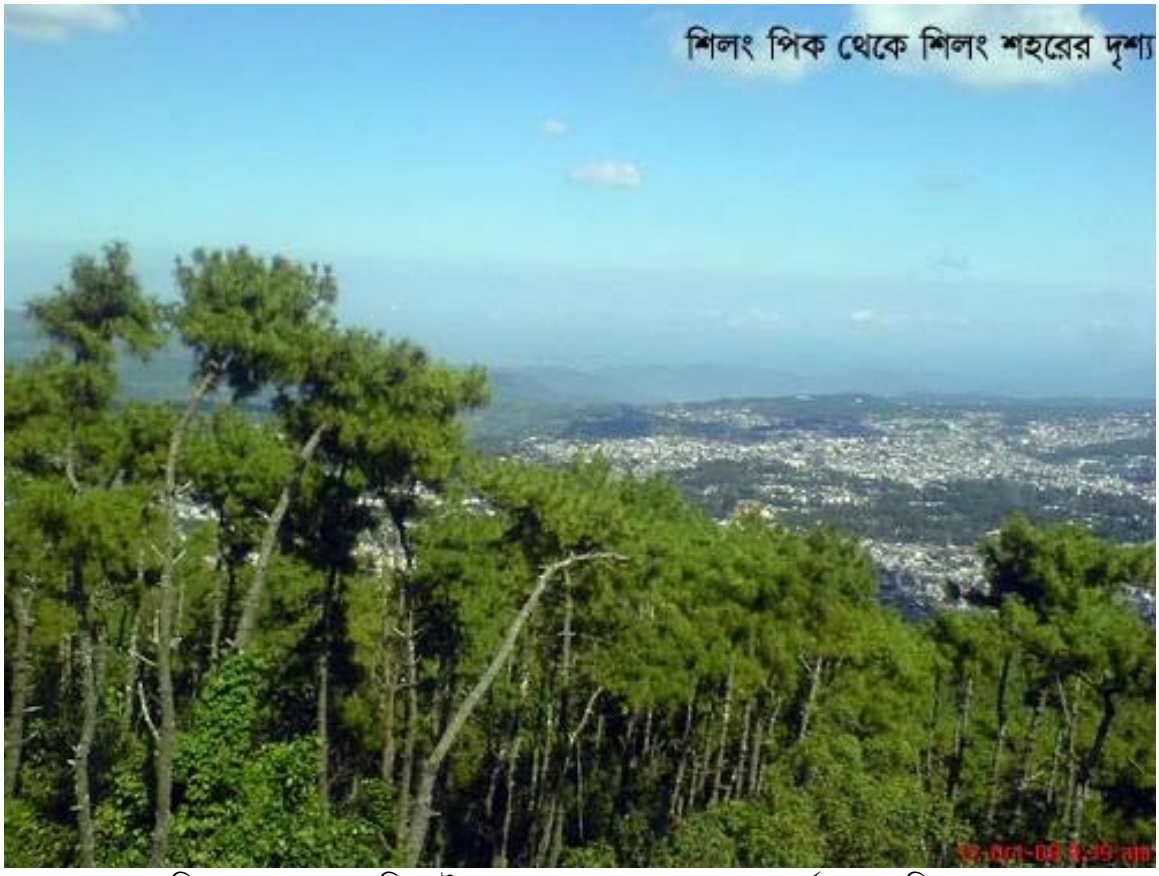

চেরাপুঞ্জিতে মামলুচেরা সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এছাড়া পুর্ব গারো হিলসের দমাস এবং জয়ন্তিয়া হিলসের সুনগাতে আরও দুটো ছোট সিমেন্ট কারখানা আছে। পূর্ব খাসি হিলসে আরও দুটো সিমেন্ট কারখানা বসাবার কথাবার্তা চলছে। তবে, চেরাপুঞ্জির পরিবেশের সঙ্গে এই সিমেন্ট কারখানাগুলো যেন ঠিক মেলে না। চেরাপুঞ্জির উন্নয়নের জন্য একটা সুষম পরিকল্পনা নেয়া উচিৎ। যতদূর জানলাম তেমন কোন পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয়ে ওঠেনি এখানে। ফলে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে যেমন খুশি নতুন নতুন বাড়ি, হোটেল ইত্যাদি গড়ে উঠছে এখানে। এখনও সাবধান হয়ে একটা সুপরিকল্পিত মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে কাজ না করলে চেরাপুঞ্জিতেও শিগগীরই মুসৌরি, সিমলা বা নৈনিতালের মত অতিরিক্ত উন্নতির কুফল ফলতে শুরু করতে দেরি হবে না।

শেষ করবার আগে মেঘালয় সম্বন্ধে কিছু কথা।

মেঘালয় রাজ্যের জন্ম হয় ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে, অবিভক্ত আসামের খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারোপাহাড়ের তিনটে অংশকে আলাদা করে নিয়ে। এই তিন অঞ্চলে এখন সাতটি জেলা হয়েছে। মূল নিবাসীরা সবাই স্থানীয় খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো উপজাতির লোক। মেঘালয় রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে আছে বাংলাদেশের নদীমাতৃক সমতলভূমি। দক্ষিণ ভাগে খাড়া পাহাড় ও গভীর গিরিখাত রয়েছে যার জায়গায় জায়গায় জলপ্রপাতের ধারা নদী হয়ে নেমে গেছে বাংলাদেশের দিকে। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং এককালে বৃহত্তর আসামের রাজধানী ছিল। মেঘালয় আলাদা হওয়ার পর আসামের রাজধানী দিসপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রাজ্যের ২২৪২৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৮৫১০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে বনভূমি। তার মধ্যে মাত্রই ৯৯৩ বর্গকিলোমিটার বনভূমি রাজ্য

সরকারের অধীন। বাকি সমস্ত বনাঞ্চল রয়েছে জেলা কাউন্সিল ও ব্যাক্তিগত দখলে। এখানকার জঙ্গলে সেগুন, শাল, গামার ছাড়াও স্থানীয় 'খাসি পাইন'(পাইনাস কেসিয়া) পাওয়া যায়। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে পাওয়া যায় মাংসাশী গাছ পিচার প্ল্যান্ট।

সমাপ্ত

(ড: গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগবানের আপন দেশের ভ্রমণকথা শুরু হচ্ছে পরবর্তী সংখ্যায়।--সমপা:)

বিচিত্র দুনিয়া

রিকশার ইতিকথা

জাপান -চায়না হয়ে রিকশা ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। এমনকি, ইউরোপ, আমেরিকা, এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেও। পৃথিবীর কিছু দেশে বর্তমানে রিকশা নিষিদ্ধ হলেও,ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে রিকশা চলছে গড়গড়িয়ে। রিকশার গল্প শুনিয়েছেন ——

অরিন্দম দেবনাথ।

রিকশা-স্ট্যান্ডে অনেকগুলো রিকশাই দাঁড়িয়েছিল। আমি চড়ব বলে এগিয়ে যেতেই বছর বাইশের পরিচিত রিকশা চালক তার রিকশাটি এগিয়ে নিয়ে পরম যত্নে বসার আসনটি কাঁধের গামছা দিয়ে মুছে বলল, উঠে পড়ুন। প্যাডেল করে দু'কদম এগোতেই রিকশাচালক ছেলেটি বলে উঠল, কিছু মনে যদি না করেন একটা প্রশ্ন করব? সবাইকে জিজ্ঞেস করতে ভয় লাগে। আসলে বউদিকে(মানে আমার স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম, কিন্তু স্কুলে যাবার সময় ট্রেন ধরবেন বলে এত তাড়াহুড়োয় থাকেন যে ভয়ে আর জিজ্ঞেস করতে পারিনা। আর আপনি তো খুব একটা রিকশায় চড়েননা, হয় হাঁটেন, নাহয় সাইকেলে যাতায়াত করেন। জানতে চাইছিলাম কি, কে রিকশা আবিষ্কার করেছিলেন বলতে পারেন? মানে রিকশা চালিয়ে খাই তো, তাই এর জনকের ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম।

কঠিন প্রশ্ন! বাড়ি এসে বইপত্র ঘেঁটে দেখলাম, 'রিক্সো' শব্দটির উৎ-পত্তি জাপানি 'জিনরিকিসা' থেকে। যার অর্থ, জিন, অর্থাৎ মানুষ, রিকি, মানে শক্তিচালিত এবং সা, অর্থাৎ ভেহিক্যাল বা গাড়ি। এককথায় মানুষ চালিত বাহন বা গাড়ি।

রিকশার উৎপত্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। আমেরিকানরা দাবি করে, আলবার্ট টলম্যান নামে এক আমেরিকান কামার ১৮৬৮ সালে ম্যাসাচুসেটস্‌এ এক মিশনারির জন্য প্রথম রিকশা বানিয়েছিলেন। আবার কিছু সূত্র বলে ১৮৬৯ সালে জাপানে বসবাসকারী এক আমেরিকান মিশনারি জনাথন স্কোবি তাঁর বিকলাঙ্গ স্ত্রীকে জাপানের ইয়োকাহামা শহরের রাস্তায় ঘুরিয়ে বেড়ানোর জন্যে রিকশার সৃষ্টি করেছিলেন। কেউ বলেন, জাপানের এক রেস্তোরাঁর মালিক ইয়ুমি ইয়োসুদি ১৮৬৯ সালে টোকিয়োতে রিকশার প্রচলন করেছিলেন। আবার ১৬৬৯ সালে প্রকাশিত একটি ফরাসি বই এরনোল্ডাস মন্টানুস-এ একটি জাপানি রাজবধূর হাতে টানা বাহনে ঘুরে বেড়ানোর উল্লেখ আছে। জাপান থেকে রিকশা ছড়িয়ে পড়ে চীন-থাইল্যান্ড-ভারত-বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

১৮৬৮ সাল। জাপানে তখন মেজি সাম্রাজ্য চলছে। জাপানিরা দেখলেন যে ঘোড়াগাড়ি থেকে মানুষে টানা হাতরিকশার খরচ অনেক কম। শুধু তাই নয়। রিকশা সরু গলির ভেতর দিয়েও অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারে। যদিও প্রথম দিকে জাপানে সবার রিকশা চাপার অধিকার ছিলনা। ১৮৭০ জাপানের টোকিও সরকার ইজুইমি ইওসাকি, সুজুকি টোকুজিরো ও কোসুকিকে রিকশা বানানো ও তা বিক্রি করার অধিকার দিলেন। ইতিহাস যাই বলুক, সরকার মনে করলেন এই তিনজন মিলেই রিকশার সৃষ্টি করেছেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের টোকিও শহরে প্রায় ৪০০০০ রিকশা চলতে শুরু করল এবং এটাই জাপানের প্রধান পরিবহন হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানে রিকশা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ তেলে চালিত মোটরযান মূলত তেলের অপ্রতুলতার জন্য হয়ে উঠেছিল ভীষণ খরচবহুল। ১৯৫০ সালে জাপান থেকে রিকশা বিদায় নিল। সেই জায়গায় এল ছোট আকৃতির মোটরযান নিনটাকু।

জাপানি রিকশা'১৮৯৮

প্রথমে কিন্তু রিকশা ছিল হাতেটানা -- যা এখনও কলকাতার রাস্তায় দেখা যায়। ১৯৩৩ সালে থাইল্যান্ডের একদল ইঞ্জিনিয়ার রিকশা আর সাইকেল মিলিয়ে জন্ম দিলেন ট্রাইসাইকেলের, যা হল রিকশার বর্তমান সাইকেল রিকশা অবতার। ভারতবর্ষে প্রথম রিকশার আবির্ভাব ঘটে ১৮৮০ সালে, সিমলাতে চিনা ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। চিনারা রিকশার আমদানি করেছিল মাল পরিবহনের জন্য। আর তারও কুড়ি বছর পরে রিকশা আসে কলকাতায়।

বাংলাদেশের ঢাকা শহরকে বলা হয় 'রিকশার শহর'। কয়েক লক্ষ রিকশা চলে ঢাকা শহর ও সন্নিহিত অঞ্চলে। কিন্তু ঢাকা শহরে রিকশা এসেছিল অনেক পরে। ১৯১৯ সালে মায়ানমার হয়ে চট্টগ্রামে প্রথম রিকশা আসে। কিন্তু ঢাকাতে রিকশা পৌঁছয় ১৯৩০ সালে। তাও চট্টগ্রাম থেকে নয়, কলকাতা থেকে। ইউরোপীয়ান পাট ব্যবসায়ীরা নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শহরে ১৯৩৪ সালে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রিকশার আমদানি করেছিল।

বিংশ শতকের প্রথমদিকে চায়নাতে রিকশার চলন শুরু হয়। প্রথম থেকেই চায়নাতে রিকশা হয়ে ওঠে মাল ও মানুষ পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। শুধু তাই নয়, চায়নার অধিকাংশ মানুষ রিকশাকে ভিত্তি করে উপার্জন করতে শুরু করে। ১৯১৪ সালে চিনারা রিকশায় মানুষ পরিবহনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে এবং অনুমতি পায়। তার পরপরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে রিকশা ছড়িয়ে পড়ে। রিকশা হয়ে যায় সাধারণ গরীব মানুষের উপার্জনের মূল মাধ্যম। ১৯২০ সালে ডেভিড স্ট্রান্ড নামে এক সাংবাদিক বেজিং-এর রিকশা নিয়ে এক প্রবন্ধতে লেখেন, ৩০ হাজার লোক বেজিং শহরে রিকশা চালায়। সেই সময়কার এক সমাজতত্ত্ববিদ্ লি জিনহান লেখেন, বেজিং-এর ছ-জন পুরুষের মধ্যে একজন রিকশাচালক। এঁদের বয়স ১৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে। বেজিং-এর মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষ রিকশা চালিয়ে উপার্জন থেকে দিন গুজরান করেন।

তারপর একটা সময় ধীরে ধীরে চায়নায় রিকশার চলন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে আবার চায়নাতে রিকশা ফিরে আসতে শুরু করেছে। কারণ,সাইকেলরিকশা ১০০ শতাংশ দূষণহীণ যান এবং চায়না ঠিক করেছে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর এক নম্বর দূষণহীন দেশ বলে নিজেকে তৈরি করবে।

১৮৭৪ সালে জাপান থেকে হংকং-এ রিকশার আমদানি হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর হংকং-এ রিকশার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৯২০ সালে হংকং-এ প্রায় তিন হাজার রিকশা চলত, যা একটা ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রের জন্য ছিল অনেক। ১৯৭৫ সালে হংকং-এ রিকশার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

২০০২ সালে দেখা যায় মাত্র গোটা চারেক রিকশা চলছে হংকং-এ। কিছু বৃদ্ধ রিকশাচালক মূলত পর্যটকদের রিকশায় শহর ঘুরিয়ে দেখাত। বর্তমানে হংকং-এ একটিও রিকশাও নেই।

ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এসব দেশে রিকশা এখনও সাধারণ মানুষের প্রধান বাহন। পৃথিবীর বহু দেশেই রিকশার চলন শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ অনেকেই মনুষ্য শক্তি চালিত যানকে সহজ ভাবে নেয়নি।

কিন্তু মজার কথা হল পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে রিকশার চলন আবার শুরু হয়ছে নতুন করে। প্রধানত পর্যটকদের জন্য। কারণ রিকশা দূষণমুক্ত যান। যেমনি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহর। ১৯৯৪ সালে কানাডার একটি কোমপানি কুড়িটি রিকশা ডাবলিনে পাঠায়। ডাবলিন শহরের মানুষের সেটাই প্রথম রিকশা দর্শন নিজেদের শহরে।

সমপাদকীয়

সংযোজনঃ

ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু এলাকায় টুরিস্টদের জন্য রিকশা চড়বার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে একে পেডি ক্যাব বা বাইক ক্যাব নামে ডাকা হয়।(বাঁয়ের ছবি) প্রাগের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতেও পেয়ে যেতে পারো এক অতি আধুনিক সাইকেল রিকশার খোঁজ।(ডাইনের ছবি) তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রিকশার প্রযুক্তিতেও এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। উন্নত প্রযুক্তির রিকশার পরিবারে শেষতম সংযোজনটি হল সোলার ক্যাব কোমপানির সৌরশক্তিচালিত রিকশা। (শুরুর ছবির সবার ওপরের ধাপের ফোটোগ্রাফটি দেখো)

আগে যা বলেছিঃ

ভরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গতি যত বারে ভরও তত বাড়তে থাকে আর কোন বস্তুর গতি যদি আলোর গতির কাছাকাছি পৌঁছোতে থাকে তখন তার ভরও অসীমের দিকে ধাওয়া করে। একে অন্যভাবে বলা যায়, যে শক্তি প্রয়োগ করলে তা ভরকে বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ শক্তি, ভরে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে অল্পস্বল্প শক্তি প্রয়োগে সেটা টের পাওয়া যাবে না। কারণ বিপুল পরিমাণ শক্তি যখন ভরে বদলে যায় তখন তা হয় অতি সামান্য ভর। আড়াই কোটি কিলোওয়াট শক্তি দিয়ে তৈরি হয় এক গ্রাম ভর। আবার তেজষ্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে এর উল্টোটা ঘটে। সেখনে ভর থেকে শক্তি তৈর হয় একই অনুপাত মেনে। এইবারে নতুন কথা।

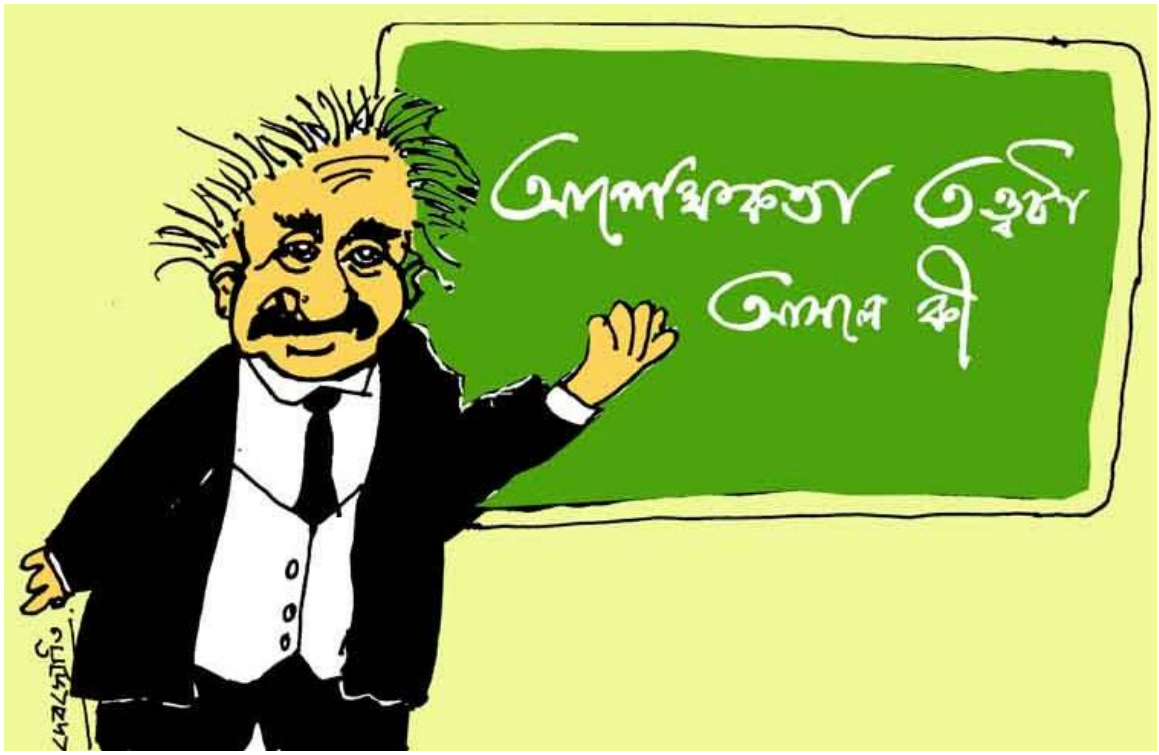

তবে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় আমরা এমন অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করি যাতে কিন্তু এই ভরের পরিবর্তন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ধরো সাইক্লোট্রন যন্ত্রে যখন পরমাণুর নিউক্লিয়াসরা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নতুন নতুন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের জন্ম দেয় তখনকার কথা। উদাহরণ দিয়ে বোঝাই-- ধরো একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটা লিথিয়াম পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটানো হল। এর ফলস্বরূপ হাইড্রোজেন ও লিথিয়ামের পরমাণুদুটো বদলে গিয়ে তৈরি হল দুটো হিলিয়াম পরমাণু। তাদের মোট ভর দেখা যাবে, সংঘর্ষের আগেকার দুই পরমাণুর মোট ভরের চারশো ভাগের এক ভাগ পরিমাণ কমে গেছে। ওই কমে যাওয়া ভরটা আসলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে পরীক্ষায় পাওয়া গেছে এক গ্রাম ভর বাড়াবার জন্য আড়াই কোটি

কিলোওয়াট ঘন্টা শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, অর্থাৎ ওই পরিমাণ শক্তি ভরে বদলে গেলে এক গ্রাম বস্তু তৈরি হয়। তাহলে, এক গ্রাম লিথিয়াম ও হাইড্রোজেনকে এক গ্রাম হিলিয়ামে পরিণত করলে তাতে যে এক গ্রামের চারশো ভাগের একভাগ ভর কমবে তাতে শক্তি বের হবে আড়াই কোটি কিলোওয়াটের চারশো ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ষাট হাজার কিলোওয়াট, অর্থাৎ ছ কোটি ওয়াট।

এবারে ধরা যাক একটা বাড়িতে ৪০ ওয়াটের পাঁচটা আলো, ৫০ ওয়াটের চারটে পাখা, ১০০ ওয়াটের একটা টিভি আছে। তাহলে সে বাড়ির বিদ্যুৎ খরচ গড়ে ঘন্টায় হবে ৫০০ ওয়াট। তাহলে ষাট হাজার কিলোওয়াট শক্তিতে সে বাড়ির কতদিন চলবে? কষে দেখো, উত্তর আসবে, তেরো বছর আট মাস বারো দিন। মাত্র একটা এক গ্রামের চারশো ভাগের এক ভাগ ভরকে শক্তিতে পরিণত করলে কতটা শক্তি পাওয়া যাবে দেখলে তো? বস্তুর পেটে এমনই ভয়ংকর শক্তি লুকিয়ে থাকে।

এবারে আর একটা মজার হিসেব দেবো। আচ্ছা বলো দেখি ওজনের হিসেবে প্রকৃতিতে সবচেয়ে দামি কোন জিনিসটা? খুঁজে পেতে দেখেছি এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম হল ১১ লক্ষ টাকা। এক গ্রাম সোনার দাম ২৩০০ টাকা। এইবারে দেখো, একটা ইলেকট্রিক আলো যখন জালান হয় তখন তাতে যা বিদ্যুৎ দেয়া হয় তার শতকরা পাঁচ ভাগই আলোয় পরিণত হয়। এক গ্রাম বস্তুর তূল্যমূল্য আলো (বা বলতে পারি এক গ্রাম আলো) পাবার জন্য লাগে আড়াই কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা শক্তি। তাহলে বিজলি বাতির থেকে মোট এক গ্রাম আলো পেতে গেলে বিদ্যুৎ খরচ হবে তার কুড়ি গুণ অর্থাৎ পঞ্চাশ কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা শক্তি। আমাদের বাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় তার দাম নেয় মোটামুটি প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টায় সাড়ে তিনটাকা। তাহলে সে হিসেবে এক গ্রাম আলোর দাম কত হল? ১৭৫ কোটি টাকা। তাই তো?

তাহলে বোঝো দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জিনিসটা কী? আর সেই জিনিসটাই সারাদিন ধরে আমরা পেয়ে যাই , এক্কেবারে ফ্রি।

ক্রমশ

ভারতের বৈজ্ঞানিক

শ্রীসেন ও রোমক সিদ্ধান্ত

টুপুর

যীশুর জন্মের প্রায় ৫০০ বছর পর রোমক সিদ্ধান্ত লিখেছিলেন শ্রীসেন। রোমক সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিদ্যার প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই বইটা শ্রীসেন সমপূর্ণ নিজেই লিখেছিলেন নাকি অগ্রন্থিত তথ্যকে গ্রন্থিত করেছিলেন মাত্র নাকি কোনো হারিয়ে যাওয়া নষ্ট বইকে নতুন করে লিখেছিলেন তথ্য সংরক্ষণের তাগিদে তা স্পষ্ট করে জানা যায় না।

রোমক সিদ্ধান্তে শ্রীসেনের কাজ নিয়ে এতো বিতর্কের কারণ হলো বইটার ওপর প্রবল গ্রিক প্রভাব। এই বইতে পূর্ণ সংখ্যায় সৌরবর্ষ এবং চান্দ্রমাস এমনকি দিনও গোণা হয়েছিল। সৌরবর্ষ মানে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার সময় যেটা মাপা হয় একটা অক্ষরেখায় সমান-সমান দিন-রাত্রির মধ্যেকার ব্যবধান বা একটা কর্কট সংক্রান্তি থেকে পরের কর্কট সংক্রান্তির ব্যবধান দিয়ে; চান্দ্রমাস মানে অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমায় পৌঁছোনোর সময়; দিন মানে অবশ্যই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। এই সমস্ত গোণাগুনি করা হয়েছিল ৪২৭ শকাব্দ বা ৫০৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ, সে সময়ের ভারতবর্ষের জন্য। অথচ সবেরই মূলে ছিল গ্রিক ধারণা এবং সূত্রাবলী। এমনকি সমস্ত অঙ্কে দিন-রাত, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বিচার করা হয়েছিল পৃথিবীর ভৌগোলিক মধ্যরেখাকে ''যবনপুর'' অর্থাৎ আলেক্সান্দ্রিয়ায় রেখে।

তাছাড়াও এই বইতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্গণনার হাল হদিশ ছিল। যেমন পৃথিবীর নিরিখে চাঁদ এবং সূর্যের গড় অবস্থাণ নির্ণয়ের অঙ্ক, চাঁদের মেরুর আবর্তনের সময় বের করার অঙ্ক, চাঁদের দীর্ঘতম এবং বাস্তব অক্ষরেখা নির্ধারণের অঙ্ক এবং আরও অনেক হিসেব। শোনা যায় যে শ্রীসেন দেড়শটা অসমঞ্জস সমীকরণের সারণী দিয়েছিলেন এই বইতে।

শ্রীসেনের রোমক সিদ্ধান্তের সমলোচকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অলবিরুনি এবং ব্রহ্মগুপ্ত। অলবিরুনির মতে বইটার সব অঙ্ক সঠিক ছিল না। আবার ব্রহ্মগুপ্তের মতে এই বইতে অজানা কোনো

নতুন তথ্য উন্মোচন করা হয় নি; অর্থাৎ শ্রীসেনের রোমক সিদ্ধান্ত কোনো মৌলিক গবেষণার ফল ছিল না।

রোমক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক অবশ্য এখনও শেষ হয় নি। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যে রোমক সিদ্ধান্ত রাখা আছে অনেকে বলেন যে সেটাও আসল নয়। আসলটা নাকি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে নষ্ট করে ফেলে নকলটা তৈরি করা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়।

টেকনো টুকটাক

বৃক্ষবিদ্যুৎ

ক। পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের পদার্থবিদ ড: কামরুল আলম খানের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তির প্রথম সফল প্রয়োগ হয়েছে কানাইঘাট জেলার রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের ইসলামাবাদ গ্রামে। পদ্ধতিটা সরল ও সুলভ। পাতরকুচি পাতার রস বের করে নিয়ে তাকে ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার করে বিদ্যুত উৎপাদন করা হয়। ইউনিট প্রতি এই বিদ্যুত ব্যবহারের জন্য খরচ বাংলাদেশি মুদ্রায় মাত্রই এক টাকা। প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিদ্যুতে সে দেশে খরচ ইউনিটপ্রতি ছয় থেকে দশ টাকা। এক একর জমিতে যত পাথরকুচি চাষ হয় তার থেকে বছরে ৬০ থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। খরচ মাত্রই বারো কোটি টাকা। এই

বিদ্যুতের প্ল্যান্ট তৈরি হলে পরিবার পিছু সংযোগ নেবার খরচ মাত্রই পাঁচ হাজার টাকা হবে। আমাদের মত গরীব দেশগুলোতে এমন সব প্রযুক্তির আজকাল খুব বেশি করে প্রয়োজন। বিজ্ঞানী কামরুল আলম খানকে জয়ঢাক অভিনন্দন জানায়।

খ। বস্টনের ম্যাগক্যাপ এঞ্জিনিয়ারিং কোমপানি গাছের থেকে বিদ্যুৎ বের করবার একটা ভারী সরল কায়দা বের করেছে। তারা পরীক্ষা করে দেখিয়েছে, গাছের গায়ে একখানা পেরেক পুঁতে তার থেকে লম্বা একখানা তার টেনে মাটির ভেতরে চালিয়ে দিলে তার মধ্যে দিয়ে ভারী মৃদু একটা তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। উপযুক্ত যন্ত্রের সহায়তায় সেই অতি মৃদু বিদ্যুৎকে কাজে লাগাবার কায়দা বের করে ফেলেছে তারা। সে দিয়ে নিকেল ক্যাডমিয়াম রিচার্জেবল ব্যাটারিতে চার্জ দেয়া ও এল ই ডি বাতি জালাবার পরীক্ষাও সফল হয়েছে। উপস্থিত এম আই টির বিজ্ঞানীরা জিনিসটা নিয়ে আরও পরীক্ষানীরিক্ষা চালাচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে পরীক্ষাটরীক্ষা সফল হলে এ দিয়ে রাস্তার আলোও জালানো যাবে।

বনের ডায়েরি

বুলঢানার বাঘ

জে জে দত্ত

১৯৫২ সালের মে মাস। চাকরিতে তখন আমার সবে দু'বছর। আমি তখন অধুনা মহারাষ্ট্রের আকোলা ও বুলঢানা জেলা নিয়ে তৈরি পশ্চিম বেরার ডিভিশনে অ্যাটাচড অফিসার হিসেবে কাজ করছি। একে গরমের সময় । তার ওপর জঙ্গলে বিদ্যুৎ নেই। ফলে পাখার হাওয়া খাবার কোন সুযোগও নেই। রাতের বেলা খোলা আকাশের তলায় শুলে পরে একমাত্র স্বস্তি মেলে। কিন্তু তাতে মুশকিল হল, ভোর চারটের সময় চোখে আলো পড়ে ঘুম ভেঙে যায়।

এহেন পরিস্থিতিতে একবার বুলঢানার একটি জঙ্গলগ্রামে এক ফরেস্ট গার্ডের কোয়ার্টারে গিয়ে আমায় উঠতে হয়েছিল। কোয়ার্টারটা বনগ্রামের একটু বাইরে। গার্ড অবশ্য তার কোয়ার্টারে থাকবার বদলে গ্রামের ভেতরে একটা ঝুপড়িতে গিয়ে থাকতো। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে জানালো, কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে রোজ রাতে নাকি বাঘ আনাগোণা করে। তাই সে নাকি ভয়ে কোয়ার্টারে থাকে না।

বললাম, 'বাঘ যে আসে তা বোঝো কেমন করে?'

সে বললো, রাতের বেলা কোয়ার্টারের আশপাশ থেকে সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, নীলগাইদের বিপদসংকেতের ডাক শুনেই সে ও কথা অনুমান করে নিয়েছে।

কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছিলাম বুঝি গ্রামের ভেতর নিজের বাড়িতে থাকবার জন্য ও'সব অজুহাত খাড়া করেছে। অতএব আমি তার কোয়ার্টারটা দখল করে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। ফরেস্ট গার্ড ব্যাপারটাকে খুব একটা সমর্থন করেনি। শেষে যখন দেখল আমায় নিরস্ত করা যাবে না, তখন বলল, রাতে যেন বাইরে না শুই।

তার কথাকে বিশেষ পাত্তা দিলাম না আমি। ঘুপচি ঘরের ভেতর মে মাসের গরমে ভাজা হবার চাইতে বাইরের ময়দানে শোয়া ঢের আরামের। সে চলে যাবার পর তাই লোডেড রাইফেল সঙ্গে রেখে বাইরের উঠোনে মশারি খাটিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করলাম।

রাত নটা নাগাদ যখন রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে শোবার জোগাড় করছি এমন সময় হঠাৎ কিছু দূরে একটা নীলগাইয়ের বিপদসূচক ডাক শুনতে পেলাম। ফরেস্ট গার্ডের গল্পটার ওপরে যে অবিশ্বাসটা জন্মেছিল সেটা অনেকটা কেটে গেল ওই ডাকটা শুনে। খানিক বাদে দুটো আলাদা আলাদা জায়গা থেকে একটা সম্বর আর একটা চিংকারার অ্যালার্ম কল শুনে ডাকগুলোর অবস্থান থেকে বাঘটার গতিপথের একটা পরিষ্কার আন্দাজ পেয়ে গেলাম। তার সমভাব্য অবস্থান আমার শোবার জায়গাটা থেকে শ'খানেক মিটার দূরে হবে। গতিপথটা গিয়েছে কাছাকাছি একটা নালার দিকে। আধা শুকনো নালাটা গ্রামের দিক থেকে বয়ে এসে আমার ঘাঁটির পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। তার মানে আমার অবস্থান থেকে নালাটার ভাঁটির দিকে শ'খানেক মিটার দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে বাঘটা।

মনের কোণে একটুকরো ভয় জেগে থাকায়, এরপর রাত্রিবেলা মাঝেমাঝে হরিণের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। ভোরবেলা উঠে তাই ব্রাশ মুখে সরেজমিনে তদন্ত করতে বের হয়ে পড়লাম। আমার ঘাঁটির সামনে দিয়ে চলে যাওয়া গরুর গাড়ির পথটার ধুলোর ওপরে একটা পুরুষ বাঘের থাবার পরিষ্কার ছাপ দেখতে পেলাম। নালাটার অনেকটাই শুকিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে তখনও জল আছে। বাঘটা তার

যেখানটাতে এসে জল খেয়েছে সেই অবধি তার থাবার ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। এতক্ষণে ফরেস্ট গার্ডের কথায় আমার পুরোপুরি বিশ্বাস এসেছে।

সারাটা দিন কাটল জঙ্গলের কাজে। বেলা বাড়তে এলাকার ডেপুটি রেঞ্জার এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে বেলা তিনটে পর্যন্ত জঙ্গলে ঘুরে তারপর ঘাঁটিতে ফিরে এসে বাঘের শিকারের কী বন্দোবস্ত হতে পার সে আলোচনায় বসলাম। বাঘের জল খাবার জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখা গেল, ঠিক ও জায়গাটুকু ছাড়া নালার উজানে বা ভাটায় শ'খানেক মিটারের মধ্যে আর কোথাও জল নেই। বাঘ যেখানে জল খেয়েছে তার বিপরীত দিকে নালার দেয়াল প্রায় পনেরো-ষোল ফিট উঁচু ছিল। তার ওপারে একটা মালভূমির মতন জমি। তাতে বড় বড় বটগাছ হয়ে আছে। নালার দেয়ালের গায়ে ফিটদশেক উঁচুতে একটা ঝোপ ছাড়া তার গায়ে লুকিয়ে থাকবার আর কোন জায়গা নেই। নালার অন্য পাড়ে উঠে পরখ করে দেখলাম সেখানকার কোন গাছের ওপর থেকেই নালার জল দেখা যায় নাকি। লাভ হল না কোন। ভেবেচিন্তে তখন একটা কায়দা ঠাওরানো গেল। ঠিক করলাম ওই নালার দেয়ালের গায়ের সেই ঝোপটার ঠিক নিচে একটা বড়োসড়ো গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে লুকিয়ে বসব বন্দুক হাতে।

গ্রামের লোকজনকে বলতে তারা কাজে লেগে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যেই গর্ত তৈরি। এমন কৌশলে সেটাকে বানিয়েছে যে বাইরে থেকে তার অস্তিত্ব ধরবার কোন উপায়ই নেই। যে বানিয়েছিল সে নি:সন্দেহে জঙ্গলে চোরাশিকারে অভ্যস্ত ছিল। অবশ্য জঙ্গলের আদিবাসীরা সকলেই লুকিয়ে একটু আধটু শিকার করেই থাকে, সে বন্দুক ছুঁড়েই হোক কি তীরধনুক দিয়েই হোক।

প্রস্তুতি শেষ হতে সন্ধে হয়ে গেল। ঘাঁটিতে ফিরে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত খাতাপত্রের কাজ সেরে এক কাপ চা আর কিছু হালকা খাবার খেয়ে নিয়ে, বন্দুক, টর্চবাতি সঙ্গে করে এসে সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে বসলাম। পেছনে পাড়ের ওপর দাঁড়ানো একটা গাছের ওপর ডেপুটি রেঞ্জার আর ফরেস্ট গার্ড উঠে বসেছে। তারা অবশ্য আমায় দেখতে পাচ্ছিল না। তবে হাঁক দিলে যাতে শুনতে পায় সেইজন্য কাছাকাছি থাকা।

শুরু হল অপেক্ষার পালা। জঙ্গল ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে তখন তার নানান শব্দ নিয়ে। নালার নুড়িপাথরের ওপর খুটখাট শব্দে বুঝতে পারছি যে খুরওয়ালা কোন জন্তু জল খেতে আসছে। জলের জায়গাটার ওপর ততক্ষণে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। শব্দ ছাড়া আর কিছু টের পাবার উপায় নেই। সেইসব শব্দের ওপরে নির্ভর করেই বুঝে নিতে হবে কোনজাতের জানোয়ার জল খেতে এসেছে। হরিণজাতীয় জানোয়ার জল খায় নি:শব্দে চুমুক দিয়ে। অন্যদিকে মাংশাসী জীবেরা জল খায় জিভ দিয়ে চকচক শব্দ করে। সে শব্দটা রাতের অরণ্যের নিস্ত তার মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে শোনা যায়।

যে জায়গাটাতে বাঘ জল খেতে নামবে বলে আন্দাজ করেছিলাম সেটা আমার বসবার জায়গাটা থেকে মাত্রই মিটারদশেক দূরে। আমার হাতঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল না হওয়ায় সময় দেখবার কোন উপায় ছিল না। রাত বাড়ছিল নি:শব্দে। হঠাৎ দূরে একটা নীলগাইয়ের অ্যালার্ম কল শুনতে পাওয়া গেল। আন্দাজে মনে হল কালকের ঠিক সেই সময়টাতেই জল খেতে আসছে বাঘ। তারপর হঠাৎ করেই খানিকক্ষণ সব একেবারে চুপচাপ।

খানিক এইভাবে কাটবার পর যখন সন্দেহ হতে শুরু করেছে যে বাঘটা বোধ হয় আমার অবস্থান টের পেয়ে গেছে ঠিক তক্ষুণি একেবারে কাছে একটা বার্কিং ডিয়ারের ভয়ার্ত ডাক শুনতে পেলাম। এদের অ্যালার্ম কলটা অনেকটা কুকুরের ডাকের মত হয়। বুঝলাম তিনি কাছাকাছি এসে গেছেন। মহা উৎকন্ঠা নিয়ে তার জল খাবার শব্দের অপেক্ষা করছি এমন সময় আমাকে অবাক করে

দিয়ে পেছনের মালভূমির ওপর থেকে একটা সম্বর সতর্কতামূলক ডাক দিল। বুঝলাম বাঘটা সটান জল খেতে না নেমে ওপারে ঘুরেফিরে শিকারের খোঁজে গেছে।

এর মিনিট পনেরো পরে আমার ডানদিকে একটা নীলগাই ভীষণ জোরে ডেকে উঠেই ছুটে পালিয়ে গেল। আন্দাজ করলাম, এইবারে বাঘ জল খেতে নামবে। মিনিট দুয়েক পরেই নালার জলের ওপর থেকে চকচক শব্দ উঠতে শুরু করল। আমাদের বাড়িতে চিরকাল কুকুর পোষা হত। তার জল খাবার শব্দ আমার চেনা। সেই শব্দটাকে পঞ্চাশগুণ বাড়িয়ে দিলে যেমনটা শোনাবে, অন্ধকারের ভেতর জন্তুটার জল খাবার শব্দ নীরব জঙ্গলে অনেকটা সেরকম শোনাচ্ছিল। এইবারে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না যে বাঘটাই জল খেতে এসেছে।

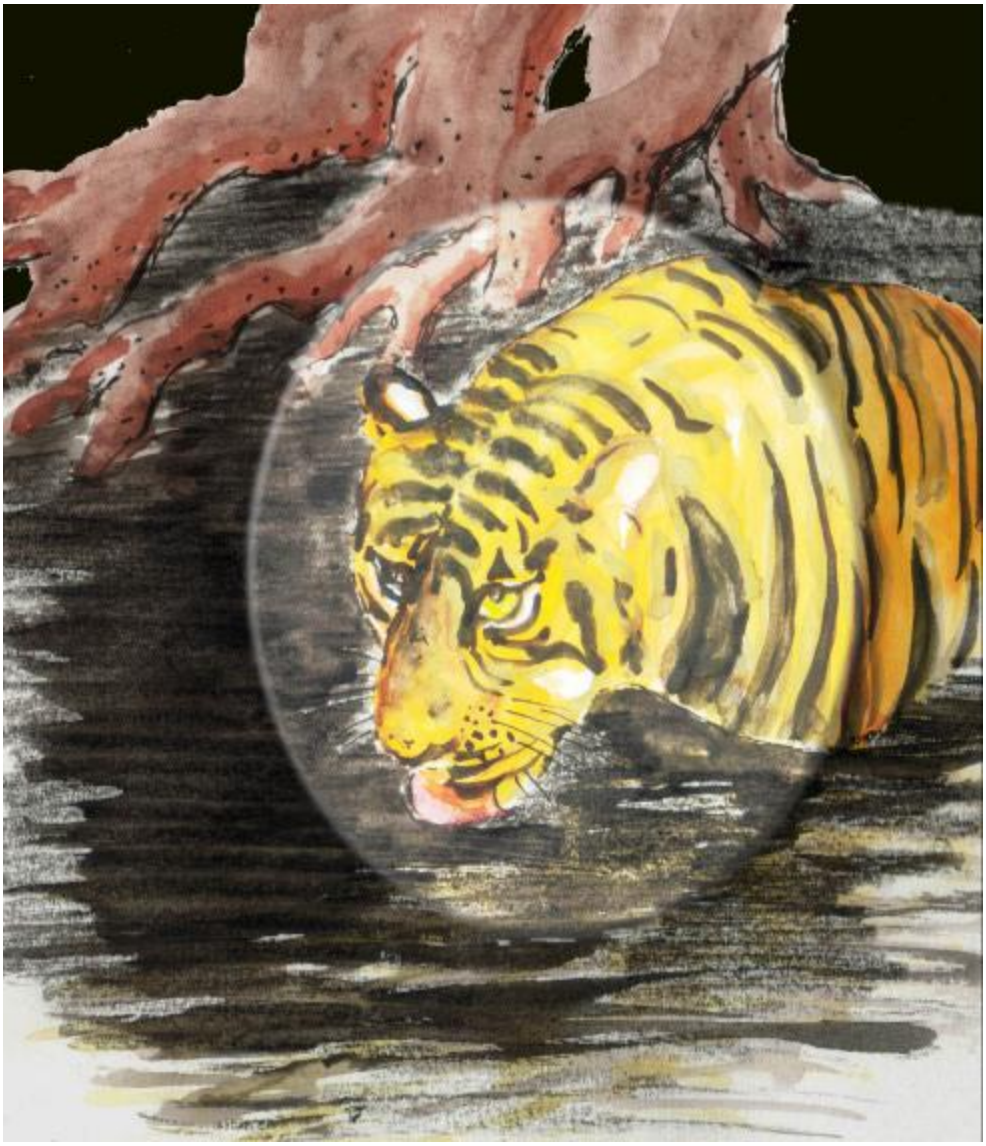

আমার সঙ্গে পয়েন্ট ফোর টু থ্রি বোরের মাউজার রাইফেলটার নলের সঙ্গে তার দৈর্ঘ বরাবর টর্চটাকে এমনভাবে বেঁধে নিয়েছিলাম যে বোতাম টিপলে তার আলোকরেখা আমার বন্দুকের লাইন অব সাইটের সঙ্গে বিলকুল মিলে যাবে। রাইফেলটা কাঁধে লাগিয়ে টর্চের বোতাম টিপতেই আলোর একটা

বর্শা ধেয়ে গেল বাঘের দিকে। জল খাওয়া ছেড়ে সে মুখ ঘোরালো আলোর দিকে। তারপর, যেন অপছন্দ হয়েছে আলোটাকে এমন ভঙ্গীতে সে তার মাথা ঘুরিয়ে নিল। মাথা ঘোরাতেই তার ঘাড়ের দিকটা আমার রাইফেলের নিশানায় এসে পড়ল। গুড়ুম করে গুলি ছুটল। বাঘটাও অমনি মুখ থুবড়ে পড়ল সেইখানেই। তার মাথাটা পড়ল জলের ভেতর।

গুলির আওয়াজ শুনে ডেপুটি রেঞ্জার অন্ধকারে গাছের ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল স্যার?'

বললাম, 'বাঘ মারা গেছে।'

উত্তরে সে ফের বলল, 'আরো একটা গুলি ছুঁড়ুন স্যার।'

হেসে বললাম, 'আমার গুলিতে যদি না-ও মরে থাকে তাহলেও জলে মাথা ডুবে শ্বাস বন্ধ হয়ে তো মরেছেই।'

এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফরেস্ট গার্ডসহ গাছ থেকে নেমে এল। ওদিকে গ্রাম থেকেও ততক্ষণে গুলির শব্দ শুনে লোকজন ছুটে এসেছে। তাদের মধ্যে বেজায় উত্তেজনা। একজন তো দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে উঁচু পাড় থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখি পাথরে মাথা ঠুকে গিয়ে তার বাঁ কান দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে আসছে। খুলির একেবারে গোড়ায় হাড় ভাঙবার লক্ষণ এটা। জীবনের প্রথম বাঘ মারবার আনন্দের ওপরে একটা মস্তোবড় কালো ছায়া ফেলে দিল এই দুর্ঘটনাটা। আর সবকিছু ছেড়ে আহত মানুষটাকে ষোল কিলোমিটার দূরে বুলঢানার জেলা হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম। ভোরভোর অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছোবার পর ডাক্তারদের চেষ্টায় আর জীবনীশক্তির জোরে লোকটা সে যাত্রা বেঁচে যায়।

বাঘটার চামড়া ছাড়িয়ে মহীশূরের ভ্যান আইগেন অ্যান্ড ভ্যান আইগেন নামের ট্যাক্সিডার্মি কোমপানিতে পাঠিয়ে দেয়া হল। প্রায় বছরখানেক বাদে সুন্দর একটা হেডমাউন্টেড ট্রোফি আমার কাছে ফিরে এল।

এরপর, যখন আমার বিয়ে হয় তখন বিয়ের আসরে এ গল্পটা শুনে আমার এক কুটুম্ব আড়ালে আমার স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, 'মস্তবড় গুল দিয়েছে জামাই। ওই পাতলা চেহারায় আর বাঘ মারতে হয়না। তিনি জানতেন না যে, বাঘ মারতে গেলে দেহের শক্তিতে কোন লাভ হয়না। চাই মনের শক্তি আর দক্ষতা। ট্রোফিটা শেষমেষ আমার শ্বশুরবাড়িতেই উপহার দিয়েছিলাম। সেটা আজ অবধি সেখানে যত্ন করে রাখা আছে।

ছবি : মৌসুমী

নীলগিরি বায়োসফিয়ার রিজার্ভ

সংহিতা

নীলগিরি মালভূমির চারপাশে মালার মতো জড়িয়ে আছে নীলগিরি বায়োসফিয়ার রিজার্ভ। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক তিন রাজ্যজুড়ে ৫৫২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে আছে এই বনাঞ্চল। নিরক্ষীয় আবহাওয়া এবং নীলগিরি মালভূমির পাহাড়ের উচ্চতায় ঠাণ্ডা আবহাওয়া এই অঞ্চলের বনে বাড়িয়ে তুলেছে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য। আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের কারণে মানুষের জীবনযাত্রাও এখানে বিচিত্র; ফলে উপজাতিগত বৈচিত্র্যেও এই বনাঞ্চল সমৃদ্ধ।

তামিলনাড়ুতে ২৫৩৭.৬ বর্গ কিলোমিটার, কর্ণাটকে ১৫২৭.৪ বর্গ কিলোমিটার এবং কেরালায় ১৪৫৫.৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় নীলগিরি বায়োসফিয়ার রিজার্ভ ছেয়ে আছে। বিভিন্ন সংরক্ষিত বনের মধ্যে মুদুমালাই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ছুঁয়ে আছে তিন রাজ্যকেই। এখানে হাতি, চিতল, কিংবা জায়েন্ট স্কুইরেল তামিল-কন্নড়-মালায়লমের ধার ধারে না, সীমা মানে না। ময়ূর কিংবা ঘুঘুরাও তাই। এখানে জঙ্গলে ঘুরলে কাঠের গায়ে পায়রা কিংবা ঘুঘুর নিটোল গোল গর্ত চোখ এড়াবে না কিছুতেই। আবার পায়ে হেঁটে বেড়ালে, বিশেষত: বর্ষায়, ঘেঁটু পাতায় পতঙ্গ দমপতিকে দেখেন নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুরুহ। সাম্বার, স্লেণ্ডার লরিস, বাঘের দেখা পাওয়া ভার। তবে কুবো, নানা জাতের হর্নবিল, গাছের ডালে ঘুমন্ত সিলন ফ্রগমাউথ এবং অবশ্যই গোখরো সাপের দেখা পাওয়া যায় অল্প চেষ্টা করলেই। কপাল ভাল (নাকি মন্দ?) থাকলে বুনো শুয়োরের মুখোমুখি হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

নীলগিরি পাহাড়ের বনের ওপর যে শুধু নিরক্ষীয় গরম আর বৃষ্টি বাদলার প্রভাব রয়েছে তা তো নয়, এখানে গাছপালার ওপর প্রভাব রয়েছে উচ্চতার, পাহাড়ের পশ্চিমঢালে অতিবৃষ্টির এবং পুব ঢালে অনাবৃষ্টির। পুরো বায়োস্ফি য়ার রিজার্ভ অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০০ মিলিমিটার থেকে ৭০০০ মিলিমিটার। ফলে পশ্চিমঢালে রয়েছে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বন, পুবঢালে রয়েছে নিরক্ষীয় শুষ্ক বন, পার্বত্য চিরহরিৎ বন ও পর্ণমোচী বন, কাঁটাগাছের বন, ঝোপঝাড়, ঘাসজমি এবং নীলগিরির বৈশিষ্ট্য পাহাড়ের মাথায় ঠাণ্ডা অতি বৃষ্টিপাত অঞ্চলের চিরহরিৎ ''শোলা'' বন।

নীলগিরি বায়োস্ফি য়ার রিজার্ভের মধ্যে কেরালা রাজ্যে বাস কান্নিকরন বা কানি (কিংবা চোলানাইকেন উপজাতির। এরা এখনও চাষ করতে শেখেনি। শিকার করে বা ফলমূল জোগাড় করে উদরপূর্তির কাজ সারে এরা। এদের সঙ্গে এথনোবটানি সংক্রান্ত কাজ করার সময় ট্রপিক্যাল বটানিক গার্ডেন এণ্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন ট্রাইকোপাস জেলানিকাস নামের লতার ক্লান্তি দূর করার ক্ষমতার কথা। পরে রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা যায় এই গাছের পাতায় থাকা বিভিন্ন যৌগের কথা, যা ক্লান্তি দূর করে। এইসব যৌগ থেকে জীবনী নামে ক্লান্তিহরা ওষুধ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের ছাড়পত্র পায় কোয়েম্বাটোরের আর্যবৈদ্য ফার্মাসি ১৯৯৫ সালে। কানি উপজাতির মানুষেরা

তাঁদের বাসভূমির এই সমপদকে ব্যবহার করতে দেবার মূল্য বাবদ প্রতি বছর ১০লাখ করে টাকা পান। ভারতে এই ঘটনা উপজাতির স্বাধিকার রক্ষার অন্যতম উদাহরণ বলে মনে করা হয়।

নীলগিরি বায়োসফিয়ার রিজার্ভের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোর মধ্যে মুদুমালাইয়ের নাম তো আগেই করেছি। তাছাড়া আছে তামিলনাড়ুতে মুকুর্থি ন্যাশনাল পার্ক, কর্ণাটকে বান্দিপুরা ন্যাশনাল পার্ক, নাগেরহোল ন্যাশনাল পার্ক, নুগু ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, কেরালায় ওয়াইনাদ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এবং সাইলেন্ট ভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। এছাড়াও কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর মধ্য আছে এরোড় জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং সত্যমঙ্গলম রিজার্ভ ফরেস্ট, তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলা এবং কোয়েম্বাটোর জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ক্রমে ক্রমে আমরা ঢুকে পড়ব এইসব বনে।

গ্রীষ্মের ছড়া

শেখর রায়

ফাটছে চাঁদি কাঠফাটা রোদ
ধর রে ছাতা ঝুল ঝাড়া
বাড়ছে তাপ বাপরে বাপ
তাড়াতাড়ি পা বাড়া।

পায়ের নীচে তপ্ত হাওয়া
হাঁটছি পথে বইছে লু
ভাল্লাগেনা আর কিছু
শুধু নুন চিনির জল খাওয়া

ঝরছে মাথার ঘাম পায়ে
লাগছে ছেঁকা গায়ে
শুনছি নাকি পড়ছে বরফ
শহর দার্জিলিং-এ

চাইনা বরফ বৃষ্টি চাই
গরম থেকে স্বস্তি চাই
বৃষ্টি না হোক কালবোশেখি
আয় নিয়ে মেঘ চাতকপাখি

ছবি : মৌসুমি

কেষ্ট পাড়ুই

তরুণ সরখেল

মহুলটাঁড়ের রাস্তা ধরে ভরদুপুরে
শুনছি নাকি কেষ্ট পাড়ুই যাচ্ছে ট্যুরে?
সঙ্গে আছে ময়রাপাড়ার নিতাই বেনে
ঝোলায় কি তার মণ্ডামিঠাই? নাও তো জেনে!
এই তো সেদিন বনের পথে দাঁতাল এসে
মনসামুদির ভাইকে পেয়ে ধরল ঠেসে
কেড়ে নিল ঝোলাটা তার কাঁঠাল ভেবে
তেমনি আজও মণ্ডা-মিঠাই কেড়ে নেবে।।
থামাও তাকে আগেভাগে ডাকো কাছে
অসময়ে ট্যুরে গিয়ে কী লাভ আছে?
ইলিশ রেঁধে খাওয়াও তাকে ভালোবেসে
কাদা মাটি গায়ে মেখে থাকুক দেশে।

ছবি: সোমা

হিংসুটি

বৈষ্ণবী

ঝগড়াকুটি, হাসনহাটি
কান্নাকাটি ছাড়বি নাকি?
কুটি কুটি কুটিলা
ছিঁচকাঁদুনি জটিলা
লাগলে গায়ে কাঁঠাল আঠা
তুলবি যে তার তেলটা কোথা
মনে হয় বিছুটি পাতা
কুটকুটুলি শুধুই কাঁটা
মুখ বাঁকানি হাসিস ভালো
হাসবি কি তুই, দাঁত তো কালো।

ছবি: সোমা

হাকিমপুর

জ্যোতির্ময় মল্লিক

বট ঝুর ঝুর তালের পাতা
খোকার মাথায় রঙিন ছাতা।

রঙিন ছাতার অনেক দাম
তার চেয়ে আন ফজলি আম।

ফজলি এখন কোথা পাই
পালকি চড়ে চালনা যাই।

চালনা যেতে হাকিমপুর
কাটল সেথা ভরদুপুর।

হাকিমপুরের মানুষগুলো
খিদের জালায় খাচ্ছে মুলো।

মুলো যাদের নেই তো ঘরে
উপোস করে তারাই মরে।

দেশে রে ভাই এমনি আকাল
সোনার দরে বিকোয় মাকাল।

ছবি: সোমা

দুষ্টু ছেলে

আশুতোষ ভট্টাচার্য

আমার ছেলের ঘুমের আগে গল্প শোনা চাই
তুমিই বলো, নিত্যনতুন গল্প কোথায় পাই?
যেই বলেছি 'আজব দেশে ছিলেন রাজা রানি'
ওমনি বলে, 'শুনবো না আর। এ গল্পটাও জানি।'
'রাজপুত্র ছুটিয়ে ঘোড়া টগবগিয়ে ছোটে--'
'তারপরে তো যুদ্ধ হবে?' ওমনি বলে ওঠে
রাক্ষস বা খোক্কস আর ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি
গল্প বলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যাবে তুমি
পরীর কথা, বাঘ সিংহ, মস্তবড় হাতি
মুগুর ভাঁজে ভীম পালোয়ান মস্তবড়ো ছাতি
রূপকথা সব কোথায় গেল? কোনদিকে? কোন দেশে?
স্বপ্ন দেখুক, গল্প শুনুক, ঘুমোক অবশেষে।

ছবি: সোমা

(এই দুষ্টু ছেলেটার জন্য এইবারে একেবারে একটা আনকোরা নতুন রূপকথার গল্প দেয়া হল কমিকসের পাতায়। তেমন রূপকথা সে কখনো শোনেনি। --সম্পাদক)

আপনি বেজায় বৃদ্ধ মানুষ

(লুই ক্যারলের ‘ইউ আর ওল্ড ফাদার উইলিয়াম’ অবলম্বনে)

আবু হোসেন

‘আপনি বেজায় বৃদ্ধ মানুষ’, বললো ছোকরা ডেকে
‘চুলগুলো সব কেমন গেছে পেকে
তবুও কেন সমস্তদিন দাঁড়িয়ে থাকেন মাথাতে ভর করে
এই বয়সে এমনটা কেউ করে?’

‘বয়স যখন অল্প ছিলো’, বৃদ্ধ উইলিয়াম
জবাব দিলেন, ‘আমিও ভাবতাম
অমন করলে মুণ্ডু ভরা বুদ্ধি আমার নষ্ট হতেই পারে।
তবে এখন, বয়স বাড়ার পরে
বুদ্ধু আমি সেইটে গেছে জানা
মাথার ওপর সকাল বিকেল দাঁড়াতে নেই মানা।’

‘আপনি বেজায় বৃদ্ধ মানুষ, বয়স তো চার কুড়ি

তার ওপরে এমন বড়ো ভুঁড়ি
তবু কেন উল্টোমুখে ডিগবাজি খান ঢুকতে ঘরের দোরে
কারণটা তার বলুন দয়া করে।'

বৃদ্ধ বলেন, 'হাত পা আমার লোহার মতন, তাই
এই বয়সেও ডিগবাজিটা খাই
লাগিয়ে গায়ে গুরুর দেয়া গোপন মলম। চাই নাকি একখানা?
এক বোতলের মূল্য সাতাশ আনা।'

'আপনি বেজায় বৃদ্ধ মানুষ, ফোকলা মুখের মাড়ি
তবুও ছটা ডাবল মাটন কারি
কেমন করে চিবিয়ে খেলেন? টেংরিগুলোও চিবিয়ে ধরে ধরে
কায়দাটা তার বলুন দয়া করে।'

'বয়স যখন অল্প ছিলো উকিল ছিলাম পেশায়
বউয়ের সাথে তর্ক করার নেশায়
কঠিন কঠিন আইনগুলো সারাটাদিন আউড়ে আমার মাড়ি
শক্ত এমন। তাইতো ওসব পারি।'

'আপনি বেজায় বৃদ্ধ মানুষ, আমরা সবাই জানি
আপনার তো দুচোখ জোড়া ছানি
(তবু) নাকের ওপর লম্বা লাঠি সকাল বিকেল ঘন্টাদুয়েক ধরে
বলুন দেখি, নাচান কেমন করে?'

'আরে এ যে জ্বালিয়ে খেলে? প্রশ্ন তো খুব তোর?
দেখাচ্ছি, রোস, আমার গায়ের জোর।
মুখটা ঘোরা, দরজাটা খোল, রাস্তামুখো একটু ঘুরে দাঁড়া,
এক ঘুঁষিতেই ফেলব নিয়ে রাস্তাপাড়ের আস্তাকুঁড়ে,
পাজি, হতচ্ছাড়া।'

ছবি: সৌভিক

গর্দভরাজের মেলা

সলমন খান এগারো হাজার আর মিঠুন চাইলে আট হাজার। শোলে সিনেমার বিখ্যাত জুটি জয় আর বীরুকে যদি কিনতে চাও তাহলে দাম দিতে হবে মাত্র ষোল হাজার।

না না আসল হিরো নয়, এগুলো হল কিছু গাধার নাম। এশিয়ার বৃহত্তম গাধার মেলা আয়োজিত হয় মধ্যপ্রদেশের উজজয়িনীতে। বহুকাল ধরেই প্রতি বছর হেমন্তের শেষদিকে নভেম্বর মাসে পাঁচ দিনের এই মেলা বসে উজজয়িনীর পবিত্র শিপ্রা নদীর পাশে। নাম গর্দভরাজ মেলা। লোকে বলে, নাকি স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে এ মেলা চলে আসছে এখানে।

রংবেরংর ফিতেটিতে দিয়ে সাজগোজ করিয়ে গাধাদের নিয়ে মেলায় আসেন তাদের বিক্রেতারা। কারো কারো গায়ে রংবেরংর নকশাও আঁকা হয়। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাদের নাম রাখা হয়

সিনেমার নায়কনায়িকাদের নামে। ক্রেতাবিক্রেতারা এসে জমা হন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগঢ়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এমন কি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও। হেমন্তের শেষদিকে কার্তিক একাদশীতে মেলার শুরু। চলে কার্তিক পুর্ণিমা অবধি।

গাধার দাম আট থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ হাজার অবধি উঠতে পারে , সে কতটা ওজনের বোঝা বইতে পারবে তার ওপর নির্ভর করে। তার সে শক্তির পরীক্ষাটা করা হয় খুব সহজে। ক্রেতা যিনি তিনি বেছে নেয়া গাধার পিঠে চেপে বসেন। তারপর দেখা হয় কতটা সহজে সে নড়াচড়া করতে পারছে হবু মালিককে পিঠে নিয়ে। তার থেকেই গাধার শক্তি আন্দাজ করা যায়। কেনবার আগে এটা করে নেয়া বিশেষ জরুরি, কারণ এখান থেকে কেনা অধিকাংশ গাধাই ব্যাবহার হয় বিভিন্ন স্থানীয় ইঁট ভাটায় ইঁট টানবার কাজে কিংবা ক্ষেতের ফসল বইবার জন্য। সে সব কাজে শক্তি লাগে। তাছাড়া গাধার দাঁত গুনে তার বয়সেরও আন্দাজ করে নেন ক্রেতারা। দুটো বড়ো বড়ো দাঁত থাকলে তার বয়স দু বছর। তিনটে হলে চার বছর। এ হিসেবটা করতেই হয় তাঁদের,

কারণ গাধা মোটামুটি এগারো বছর অবধি কর্মক্ষম থাকে। গাঁটের কড়ি খরচ করে যাকে কিনলেন সে কতদিন সেবা করতে পারবে মালিককে সেটা বুঝে নেবার জন্যই এই দাঁত গোনা।

এবারের মেলায় তো এমনকি রাজস্থানের উদয়পুর থেকে আসা এক গাধাওয়ালার খোঁজ মিলেছে। গাধাওয়ালা বত্রিশটা গাধা নিয়ে উদয়পুর থেকে ৬০০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মেলায় এসেছিলেন গাধা বেচতে।

গাধার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইদানিং এ মেলায় ঘোড়াটোড়াও বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। আর এদিকসেদিক ঘুরলে, গাধার সাজসজজা, গাধা পোষার বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের দোকানও মিলে যাবে।

শুধু উজজয়িনীতেই নয়, গাধার মেলা বসে ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও। যেমন ধরো রাজস্থানের সাঙ্গানের। গত পাঁচ শতাব্দি ধরে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে এখানে গাধার মেলা বসছে। বর্তমানে নিখিল ভারত গর্দভ উন্নয়ন মেলা কমিটি, জয়পুর পুরসভা ও রাজ্য পশুপালন দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই মেলা হচ্ছে। সারা ভারতের গাধা এনে জড়ো করা হয় এ মেলায়। কেনাবেচার পাশাপাশি চলে গাধার রেস ও গাধা নিয়ে অন্যান্য খেলাধুলোও।

গর্দভরাজের মেলার সঙ্গে প্রায় একই সময়ে গুজরাটের আমেদাবাদের থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে সবরমতি ও বর্তক নদীর সঙ্গমে ভাউথা নামের এক জায়গাতেও, কার্তিক পুর্ণিমার স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে এক বিরাট গাধার মেলা বসে। পাঁচদিনের এই মেলায় গড়ে ৭০০০ গাধার কেনাবেচা চলে। এখানেও গাধার গায়ে রংচং করে তাকে আকর্ষণীয় বানিয়ে তোলা হয়। ভাউথার মেলার সময় এলাকার লোকজন ঘরে তালা দিয়ে এসে মেলার মাঠে ওঠে । ২০০০ তাঁবু খাটিয়ে প্রায় হাজার পঁচিশ লোক পাঁচদিন ধরে মেলার মাঠেই থেকে যায়। গাধা কেনাবেচার পাশাপাশি চলে খাওয়াদাওয়া , হইহুল্লোড়। সবশেষে কার্তিকপুর্ণিমায় সঙ্গমস্নান সেরে সবাই বাড়ি যায়। অনেকেরই হাতে তখন ধরা থাকে নতুন কেনা গাধার দড়ি।

তা কি ভাবছো? যাবে নাকি গর্দভরাজের মেলায়? কিংবা ধরো ভাউথায় বা সাঙ্গানের-এর মেলায়? তাহলে আগামি অক্টোবরে চলে এসো সাঙ্গনের-এ। চাইলে পরে কার্তিকের একাদশিতে শিপ্রা নদীর ধারে প্রাচীন শহর উজজয়িনিতে। অথবা সবরমতি ও বর্তকের সঙ্গমে ভাউথাতেও চলে আসতে পারো সবাই মিলে। ভালো দেখে একখানা গাধা কিনে এনে মাঝে মাঝে তাইতে চেপে ইশকুলে যাওয়া কিংবা হাওয়া খেতে বেরোন যাবে। মন্দ কি!

ভাবছ বুঝি মজা করছি? শহরের রাস্তায় আবার গাধা চলে নাকি? উঁহু, আমি কিন্তু মোটেই মজা করছি না। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় কিন্তু শহরবাজারে পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিলো ওই গাধা। অথবা ধরো, আজকের ইথিওপিয়ার রাজধানী আদিস আবাবা। সেখানে তো বুধ আর শনি এই দুটো বাজারের দিনে গাধার ভিড়ে পথ হাঁটা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

এই মুহূর্তে পৃথিবীতে গাধা আছে সাড়ে চার কোটি। তার মধ্যে চিনেই রয়েছে এক কোটি দশ লক্ষ গাধা। তারপরেই আফ্রিকার ইথিওপিয়ার স্থান। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ গাধা রয়েছে (বারোজন মানুষ প্রতি একখানা গাধা।) সে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ খাড়াই পাহাড়ের মাথায় গ্রাম বানিয়ে থাকেন। সেখানে মোটরগাড়ি পৌঁছোয় না। যাতায়াতের জন্য গাধাই সম্বল। সে দেশের রাজধানী আদিস আবাবায় গেলে দেখতে পাবে পথে আধুনিক গাড়িঘোড়ার ফাঁকফোকড় গলে পিঠে মালের বস্তা নিয়ে হেঁটে চলেছে অজস্র গাধা।

বুধ আর শনিবারে সে শহরের রাস্তার হাল তো আগেই বলেছি। কেনিয়াতেও ব্যাপারটা অনেকটা একইরকম।

দুনিয়ায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ গাধাই পোষা হয় পরিবহনের কাজের জন্য। কোথাও কোথাও গাধা দিয়ে চাষবাস করা হয়, ফসলের ঝাড়াইমাড়াইও করা হয়। ইতালি ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় গাধার মাংস খাওয়া হয়। ফলে সে এলাকায় গাধার সংখ্যা কমে আসছে। কিন্তু উত্তর ভারত, উত্তরসাহারা আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ক্রমশ গাধার সংখ্যা বাড়তে থাকায় দুনিয়া জুড়ে গাধার সংখ্যা এই মুহূর্তে বাড়তির দিকে। এই প্রসঙ্গে বলি ভারতে প্রায় ষোল লক্ষ গাধা রয়েছে।

শেষ করবার আগে আরও একটা কথা। গাধা কিন্তু মোটেই বোকা নয়। তার বুদ্ধি ঘোড়ার থেকে বেশি। একা একা পথ চিনে যাতায়াত করতে সে ওস্তাদ। দিক চিনতে তার জুড়ি নেই। পিঠে মালের ওজন অতিরিক্ত হলে বা ঠিকমতো মাল বাঁধা না হওয়ায় যদি তার ব্যথা লাগে, সে মোটেই তা মুখ বুঁজে মেনে নেয় না। সটান শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানায় যতক্ষণ না তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

চলো তবে, গাধা পুষি সবাই মিলে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক হিতবাদ পত্রিকা, ভারতওয়েভস্ ডট কম নামের ওয়েবসাইট, দা ডংকিস্যাংকচুয়ারি অর্গ (ইউকে) নামের ওয়েবসাইট এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পল ও ম্যালকম স্টারকে-র রিজিওনাল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ডস্ ইন ডাংকি পপুলেশন নামের গবেষণাপত্র।

'খুব জোর বেঁচে গেছি পরশুদিন, বুঝলি ইন্দ্র!' এই বলে মামামনি চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিলো।

বললাম, 'তোমায় আবার মারবেটা কে? তোমার শত্রু কেউ আছে নাকি?'

' তা ঠিক। তবে শত্রু নয়, পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম, বুঝলি! ঠাকুরপাড়ার দিকে খালের ওপর দিয়ে একটা সাঁকো আছে দেখেছিস তো! পরশু অনেক রাতের দিকে ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে শর্টকাট মেরে পাড়ায় ঢোকবার চেষ্টা করছিলাম। তা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখি একটা মুশকো চেহারার লোক তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা দা। ভাবলাম ডাকাত টাকাত হবে। হাতের ঘড়িটা দিয়ে দেবো বলে সবে খুলছি তখন সে হা হা করে হেসে বলে, 'আমি ধর্মরাজ, ঘড়িতে কী কাজ?'

বুঝে গেলাম, কেসটা সুবিধের নয়। হাত জোড় করে বললাম, 'হে ধর্মরাজ, আজ্ঞা করুন প্রভু।' তা সে বলল, 'ওহে যুধিষ্ঠির, তোমাকে এখন কিছু একটা বলতে হবে। সেটা মিথ্যে হলে তোমার মুণ্ডুটা এই দায়ের এক কোপে উড়িয়ে দেবো আর সত্যি হলে গলাটা টিপে ধরে একটু একটু করে মারবো। এখন , যা ইচ্ছে হয় একটা কিছু বলে ফেলোতো বাবা। আমিও কাজটা সেরে হাওয়া খেতে যাই।'

'উ: এ তো রোমাঞ্চকর অবস্থা। তারপর? নিশ্চয় তোমার বিখ্যাত যুযুতসুর এক প্যাঁচ মেরে--'

'আরে ধুস্। ওসব আবার কে করে? আমি একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলাম, লোকটা ওমনি ভ্যাবল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, আর আমিও তার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে দিব্যি ফিরে এলাম। প্রশ্ন হল স্টেটমেন্টটা আমি কী দিয়েছিলাম সেইটে বলতে হবে। এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা: একটা বিশাল প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়ায় তোমার রাস্তা হারিয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে ঘুরতে ঘুরতে একটা হলের মধ্যে এসে তুমি দেখলে তাতে দুটো দরজা। একটা লাল আর একটা নীল। তার মধ্যে একখানা খুলে তুমি আর একটা ঘরে এসে ঢুকলে। সেখানেও একটা হলুদ দরজা আর একটা সবুজ দরজা। তার যেকোন একটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে তুমি দেখলে আর একটা ঘর তাতে একটা সোনালি হ্যান্ডেল ওয়ালা দরজা আর একটা রুপোলি হ্যান্ডেল ওয়ালা দরজা। তার যে কোন একটা খুলে ভেতরে ঢুকে তুমি তিনটে দরজা পেলে। তার একটা লেখা 'বাইরে বেরিয়েই জলে ডুবে মৃত্যু, একটা লেখা 'বাইরে বেরিয়েই ইলেক্ট্রিক শকে মৃত্যু' আর তৃতীয়টায় লেখা 'বাইরে বেরিয়েই বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু।' তার উল্টোদিকের দেয়ালে লেখা, 'অথবা প্রাসাদে আটকে থেকে না খেয়ে মৃত্যু।' বাঁচতে হলে তুমি কী করবে?

কুইজ

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের সম্রাট কে ছিলেন?

২। আজকের গ্রেট ওয়াল অব চায়না কোন চিনা সাম্রাজ্যের যুগে তৈরি?

৩। ২০০৮ সালে নেপাল থেকে যখন রাজতন্ত্র নির্বাসিত হল, তখন নেপালের শেষ রাজা কে ছিলেন?

৪। মধ্য এশিয়ার এই খোঁড়া শাসক ছিলেন বাবরের পূর্বপুরুষ। কে ইনি?

৫। কোন অসুর রাজার আগমনের স্মরণে ওনাম উৎসব পালিত হয়?

৬। চার্চ অব ইংল্যাণ্ডকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের থেকে আলাদা করেছিলেন কোন বৃটিশ রাজা?

৭। দিল্লির মসনদে একমাত্র মহিলা সুলতান কে ছিলেন?

৮। মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পত্তন কে করেছিলেন?

৯। জম্মু কাশ্মীরের বর্তমান রাজা কে?

১০। ইংরেজদের হাতে রাজ্য হারাবার আগে মুঘলরা আরও একবার এ দেশের সাম্রাজ্য হারিয়েছিল। কোন জাতির ও কোন যোদ্ধার হাতে?

জানো কি?

১। চোখের তারার ছোটবড় হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে যে অরবিকুলারিস অক্যুলি নামের পেশি সেটি হচ্ছে আমাদের শরীরের সবচেয়ে দ্রুতগতিসমপন্ন পেশি।

২। অক্সিজেন ছাড়া মানুষের মস্তিষ্ক ছ মিনিট অবধি বেঁচে থাকতে পারে।

৩। পেট গুরগুর করাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় বারবোরিমাস।

৪। ছেলেদের গলার অ্যাডামস্ অ্যাপলকে অপারেশন করে ছোট করার নাম কন্ড্রোল্যারিঞ্জোপ্লাস্টি।

৫। একটা কাঠের নৌকোকে চামড়া দিয়ে মুড়ে ১৬২০ সালে প্রথম ডুবোজাহাজ বানিয়েছিলেন কর্নেলিয়াস ওয়ান ড্রাবেল।

৬। প্রথম মহাকাশচারী কুকুর হল রাশিয়ার লাইকা। সে ছিল সাময়ধুশকি প্রজাতির কুকুর।

৭। ওজনের একক পাউন্ডকে ছোট চেহারায় লেখা হয় এল বি। কথাটা এসেছে পাউণ্ডের ল্যাটিন রূপ লিব্রা থেকে।

৮। টোকিয়োর আগের নাম ছিলো ঈডো।

৯। অ্যাঞ্জেল ফলস হলো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত। এটি নায়গারার থেকে ঊনিশ গুণ বেশি উঁচু।

১০। ফলচাষের বিজ্ঞানকে বলা হয় পোমোলজি।

ড্রুডলঃ

বলো তো এটা কীসের ছবি?

কীসের ফটোঃ

এটা হলো রাত্রিবেলা মাছ ধরবার ছবি। তাই তো? মোটেই না। ছবিতে দেখা জিনিসগুলো মোটেই পুকুরের জল কিংবা ফাতনাওয়ালা ছিপ নয়। ওরা কী জিনিস কেউ বলতে পারবে?

মজার খেলাঃ

সাতটা সমকোণী ত্রিভূজ দিয়ে এই তিমি মাছটাকে ধরো দেখি?

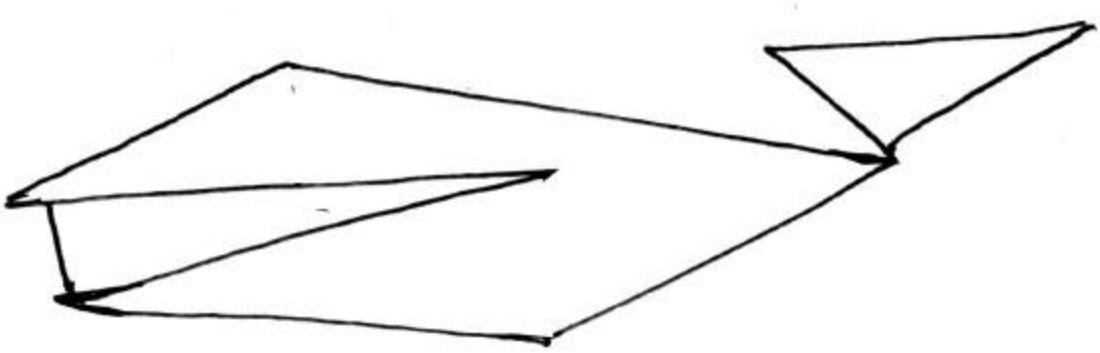

একটা গোপন কথা বলি শোন। জয়ঢাকের বুড়ো সমপাদক কিন্তু সুযোগ পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে কমপিউটার গেমস খেলতে বসে যায়। স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান, ব্যাটম্যান আর আরও যত সুপারহিরো আছে সবার সঙ্গেই সে খেলতে ভালোবাসে খুব। এবারে তাই 'মজার ইন্টারনেট'-এ বুড়ো সমপাদকের প্রিয় একটা সাইটের খোঁজ রইল তোমাদের জন্য জয়ঢাকে। সমস্ত সুপারহিরোর সঙ্গে দারুণ মজার মজার গেমসের ভাণ্ডার সাজানো আছে এখানে। ইচ্ছেমতো সুপারম্যান কিংবা স্পাইডারম্যান হয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে চাইলে অবশ্যই এসো এই সাইটে: http://superheroes.spieler24.info/

সুপারহিরোর সঙ্গে খেলা খুব দারুণ বটে, কিন্তু তার চেয়েও দারুণ হল এই লাইন টানবার খেলাটা। বলবে, লাইন টানা কী এমন বড়ো ব্যাপার। কিন্তু এই সাইটে গিয়ে যন্ত্রের তৈরি রকমারী বাধা পেরিয়ে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছোতে গিয়ে বিচিত্র , উদ্ভট সব লাইন ভেবে বের করতে হবে খেলুড়েকে। সে ভারী মজার চ্যালেঞ্জ। খেলতে এলে বেজায় মজা যে পাবে তোমরা এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। চেষ্টা করে দেখো একবার! http://drawinggamesonline.org/amaze

অবিশ্বাস্যঃ

উড়ুক্কু মোটরগাড়ি? সাংঘাতিক!!!!!!!!!!!!!!!!!!

গত সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধার উত্তরঃ

প্রথম ধাঁধা: একটা ছেলে লেবু হাতে টুকরির মধ্যে ঢুকে বসেছিল।

দ্বিতীয় ধাঁধা: ত্রিভূজের দুটো ধারের যোগফল তৃতীয় ধারের চেয়ে সবসময় বড়ো হয়। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। অতএব এ'রকম মাপের ধারযুক্ত কোন ত্রিভূজ বানানো সমভব নয়।

তৃতীয় ধাঁধা: নদএবা (এক দুই তিন চার--এদের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে প্রথম সেট। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় সেট তৈরি হবে।)

কুইজের উত্তরঃ

১। লেডি ক্যানিং ২। ক্যাম্বেল হাসপাতাল ৩। পার্ক স্ট্রিট সিমেটারিতে। ৪। হাওড়া ব্রিজ ৫। জব চার্নক ৬। শহীদ মিনার ৭। সাউথ সিটি টাওয়ার (৩৫ তলা)

ড্রুডলের উত্তরঃ

জিরাফে টেলিফোন গিলেছে।

কীসের ফটোঃ

ওয়েস্টার্ন শর্ট হর্নড্ ওয়াকিং স্টিক নামের পোকার ছবি।

হযবরলঃ

জয়ঢাক পত্রিকা, রসগোল্লা সন্দেশ, ইলিশ মাছ ভাজা, একটাকার নোট।

প্রশ্নের উত্তর: মালির কাজটা।

মজার খেলার উত্তরঃ

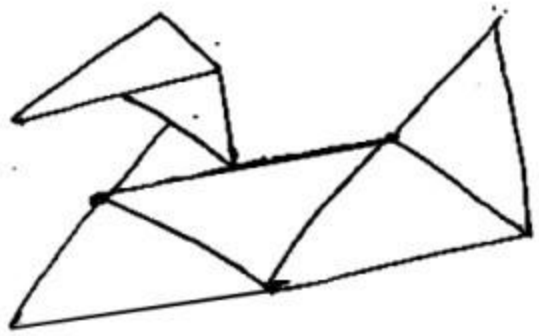

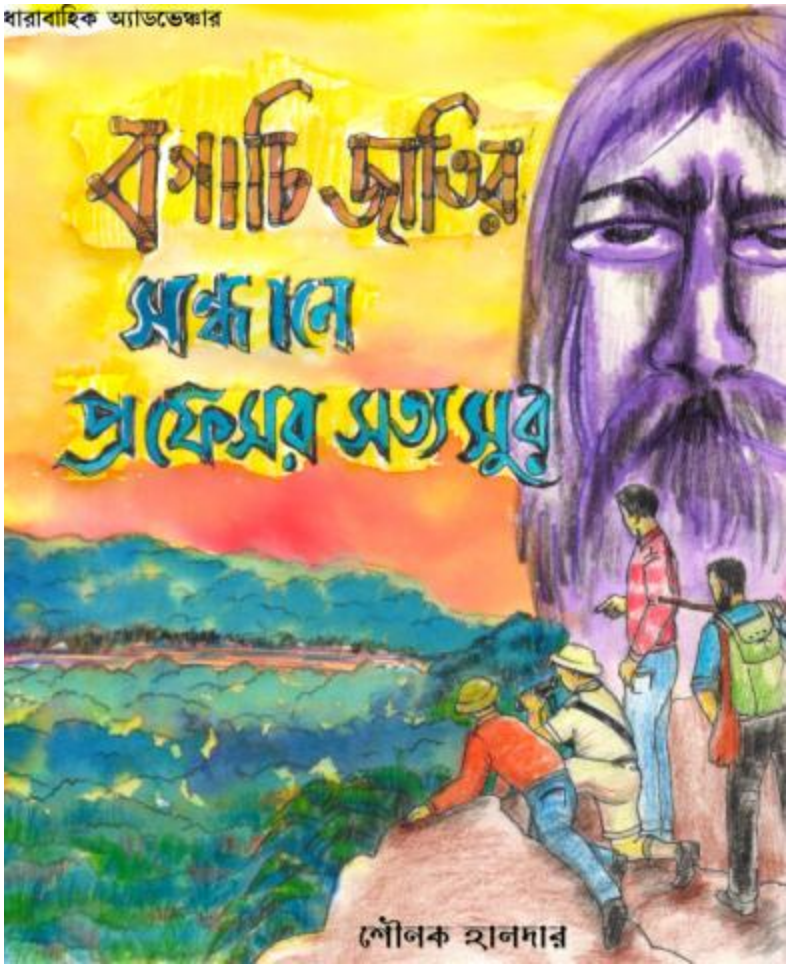

বর্মামুলুকের পাহাড়ে ইহুদিদের হারিয়ে যাওয়া শাখার খোঁজে বেরিয়ে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা এসে পৌঁছোল আইজল শহরে। সেখানে শোনা গেল, মৃত্যুর পরে আত্মারা একটা হ্রদের দিকে চলে যায়। সে হ্রদ ছাড়িয়ে স্বর্গভূমি 'পিয়াল'। মৃতের হ্রদের খোঁজে অভিযাত্রীরা রওনা দিলেন চামপাইয়ের দিকে। পথে দাপুং গ্রামের গাঁওবুড়োর কাছে জানা গেল বহুকাল আগে নীলপর্বতে এক অমিশুকে জাতি থাকত। গত একশো বছর ধরে তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পাহাড়ের পুবদিকের এক হ্রদের ধারে মায়াবলে লুকিয়ে রয়েছে। দাপুং ছেড়ে খানিক গিয়ে শুরু হল দুর্গম পায়ে হাঁটা পথ। তারপর--

অভিযান পর্ব- ২

অধিরাজের ডায়েরি থেকে:

৫ই নভেম্বর

কত রাস্তা যে পায়ে হেঁটে পার হলাম, তা খেয়াল ছিল না। চারপাশের দৃশ্য যে কত সুন্দর হতে পারে ভারতের এই প্রান্তে না এলে বোধহয় জানতে পারতাম না। উত্তুঙ্গ হিমালয় দেখেছি, মালভূমির পর্ণমোচী জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতাও আমাদের কারুর কম নয়। তবু, সেই নীল ও সবুজের ক্রমবিস্তারি পাহাড়ি পথ আমাদেরকে চুম্বকের মতন আকর্ষণে যেন ওপরের দিকে টেনে নিয়ে চলছিল। দানিকেন ও চঞ্চলদা হাসাহাসি করতে করতে এগোচ্ছিল। হঠাৎ সত্যদা আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলল,''দ্যাখ ওপরে''। রডোড্রেনড্রনের ডাল আর ঠাসাঠাসি পাতার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে গাঢ় নীল রঙ ধরেছে। জলভরা কালো-সাদা মেঘে ছেয়ে গেছে। আমি ও অতনু ক্যামেরা ধরলাম।

থাঙ্গা লম্বা লম্বা নি:শ্বাস ফেলে এদিকওদিক কি যেন শুঁকছিল। খুব ব্যাজার মুখ করে জানালো,''ভারী বৃষ্টি আসছে----''

''ওদিকে যে সন্ধে হতে চলল। থাঙ্গা তোমার গ্রাম কতদূর?''

থাঙ্গা বলল,'' বৃষ্টি পড়লে আর এগোনো যাবে না।''

সত্যদা নির্দেশ দিল,''থাঙ্গা, আশ্রয় খোঁজো। ক্যামপ করতে হবে।''

থাঙ্গা একটা উচুঁ দেখে মজবুত ডালের ওপরে সড়সড় করে উঠে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চারপাশে দেখে নেমে এল। খুব উত্তেজিত মুখে বললো,''সামনে মিলিয়েনের গুহা। ওর কাছেও যদি পৌঁছতে পারতাম! আশেপাশে অনেকটা সমতল আছে, তাঁবু খাটাতে সুবিধা হবে---- খুব জোরে হাঁটতে পারবেন আপনারা? নইলে মাঝখানে বৃষ্টি নেমে পড়লে বিপদ।''

''খুব পারবো''।

সকাল থেকেই একটানা হেঁটে চলেছি। একটু যে ক্লান্ত লাগছিল না,তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সেসব ভুলেটুলে সবাই বড়ো বড়ো পা বাড়ালাম। তখনো অবশ্য জানিনা, এখানকার বৃষ্টি কি ভয়াবহ হতে পারে!

মিনিট কুড়ি পরেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল পড়তে শুরু করলো। মেঘগুলো নেমে এসে মাথার উপরে ঝুলে পড়েছে। পেছনের ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘ ছিঁড়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে গেছে। হাঁচোড়পাঁচোড় করে উঠছিলাম। অনেক ওপর থেকে থাঙ্গার গলা পেলাম,''চলে আসুন, পৌঁছে গেছি---''। চঞ্চলদার গলাও পেলাম। সত্যদা বোধহয় একটু পিছিয়ে পড়েছিল। দানিকেন সত্যদাকে উঠতে সাহায্য করছিল।

এমন সময়ে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে গেল। খানিকক্ষণ চোখের সামনে সবকিছু যেন আবছা হয়ে গেল। কিছু দেখতে পেলাম না আর। আর ঝমঝম শব্দে কানে তালা লেগে গেল। হালকা আওয়াজ পেলাম যেন অতনু ডাকছে। মনে হল যেন বলছে,'' কি রে , দাঁড়িয়ে গেলি কেন? উঠে আয়।''

আসলে ওর কথার আওয়াজ কানে আসছিল না বৃষ্টির শব্দে। ওপর থেকে আমার দিকে ঝুঁকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। দু পাশ থেকে গাছপালারা বৃষ্টি ধাক্কায় দাপাদাপি করছে, পায়ের তলায় কাদামাখা পাথর পিছলোতে শুরু করেছে। আর চারধারে কোথা থেকে লুকানো শতেক ফোয়ারা যেন নাচানাচি করতে করতে আমাদের যাবার রাস্তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওপর থেকে কার যেন একটা আর্তনাদ শুনলাম। তারপর সত্যদার বাজখাঁই গলা শোনা গেল, ''দানিকেন পড়ে গেছে---''

'' আমরা আসছি---- দাঁড়াও,'' হাঁক দিয়ে বললাম আমরা। নিচে থেকে প্রায় ঘন্টাখানেক পরে আমরা ওপরে মিলিয়েনের গুহা এলাকায় তাঁবু গাড়লাম। সবাই ভিজে একেবারে জবজবে।

সত্যদা কাদা মেখে ভূত। দানিকেনের পায়ে লেগেছে। দেখতে দেখতে চারদিক জুড়ে অন্ধকার নেমে এল। বৃষ্টি একটু ধরেছে। চারপাশে কনকনে ভিজে ঠান্ডা। তাঁবুর আশপাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগলো। দানিকেনের বিশ্রামের ব্যবস্হা করে রান্নায় লেগে গেলাম। এটা আমার খুব পছন্দের কাজ। এই ঠাণ্ডায় খিচুড়ি যা জমবে না! স্টোভ জালানোর চেষ্টা করছি, এমন সময় তাঁবুর পর্দা সরিয়ে অতনু ঢুকল, ফিসফিস করে বলল, ''সত্যদা ডাকছে।''

বাইরে বেরিয়ে দেখি সবাই কী যেন দেখছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার আলোয় পরিষ্কার দেখলাম, সামনের এক নীচু টিলার ওপরে থাঙ্গা হাঁটু গেড়ে দুহাত ছড়িয়ে বসে আছে। সুর করে কী যেন বলছে। থাঙ্গার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম যে সামনেই একটু উঁচুতে একটা অতিকায় পাথর। অন্ধকারে সেটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাপ্রাণীর মুণ্ডের মতন লাগছিল।

সত্যদা ফিসফিস করে বললো,''দানিকেনের ভালোই লেগেছে। বাকি রাস্তায় না ভোগে।''

''একটা ব্যথা কমানোর ওষুধ দিয়ে দাও সত্যদা। কাল যদি কোনো গ্রাম-ট্রামে পৌঁছই তবে ট্রিটমেন্ট শুরু করা যাবে। অধি, তোর কাছে ওষুধের বাক্সটা আছে না? দ্যাখ তো!'' চঞ্চলদার নির্দেশ শুনে আমি তাঁবুতে ফিরবো কি না ভাবছি, তখন হঠাৎ একটা বিটকেল চীৎকারে গা শিউরে উঠল।

দানিকেনের গলা না? সবাই মিলে দৌড়ে গিয়ে দেখি তাঁবুর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক কিমভূতকিমাকার মূর্তি। আলোআধাঁরিতে প্রথমে বুঝতে পারলাম না ওটা কী? ভালুক নাকি একটা অতিকায় শজারু, নাকি অতিপ্রাকৃত কিছু??

চঞ্চলদা ঘুঁষি পাকিয়ে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই বিদ্যুতের গতিতে থাঙ্গা ছুটে এল। চীৎকার করে বললো, ''মেরো না, মেরো না।''

দানিকেনের চীৎকার তখনো থামেনি। হঠাৎ ঝটকা মেরে মূর্তিটা পেছন ফিরল। আর সঙ্গেসঙ্গেই সত্যদার ছ'ব্যাটারির টর্চ ঝলসে উঠল তার মুখের ওপরে।

এ কে? কী বিকট চেহারা?

''এ তো দেখছি মানুষ!'' আমরা সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম। সারা গায়ে আঁকিবুকি আর হাড়ের মালা, পরণে রঙিন শাল, কোমরে ফেট্টি দিয়ে বাঁধা চকচকে দাও আর মাথায় পাখির পালকের বিশাল শিরস্ত্রাণ বা হেডড্রেস। কঙ্কালের মতন দাঁত বের করে হা: হা: করে হেসে উঠল সে। গমগমে গলায় কী যেন বলতে চাইল। থাঙ্গা তাকে আড়াল করে এসে দাঁড়ালো। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, ''আমাকে বলতে দাও--- ওকে মেরো না।''

কঙ্কালের মতন দাঁত বের করে হা: হা: করে হেসে উঠল সে

থাঙ্গা আর সেই আজব মানুষটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে এর মধ্যে চঞ্চলদা ঢুকে পড়েছে তাঁবুতে। দানিকেন তখনো সেখানে চীৎকার করে চলেছে। চঞ্চলদা ঢুকতে তার চীৎকার থামল।

ধীরেসুস্থে থাঙ্গার কাছ থেকে শুনলাম লোকটা আসলে উত্তরের গ্রামের পুরোহিত। এখানে ওদের দেবস্থানে পুজো দিতে এসেছিল। বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিল। মানুষ দেখে আলাপ করতে এসেছিল।

'' এটা কি আলাপ করার নমুনা?'' দানিকেন রাগে গড়গড় করে উঠল।

''আমার তাঁবুতে উঁকি দিয়ে কিসব মন্ত্র পড়ছিল ফিসফিস করে আর কুকুরের মতন মুখ শুঁকছিল---- আমি তো চোখ খুলে ঐ মূর্তি দেখে ভয়েই সারা।''

পুরোহিত কি বুঝল জানিনা। আওয়াজ করে ফের হেসে উঠল।

এমন সময়ে সত্যদা জিজ্ঞেস করল যে ঐ উঁচু পাথরটাই সেই দেবস্থান কি না, তার উত্তরে থাঙ্গা বললো, ''হ্যাঁ স্যার, দেখবেন স্যার?'' থাঙ্গা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল। তার গলার স্বরও নরম।

টিলাটার মাথায় উঠে টর্চ মেরে দেখতে পেলাম একটা অতিকায় মনোলিথ, তার গায়ে খোদাই করা মানুষের মূর্তি। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে যেমনি ছোট ছোট পুতুলের মতন মানুষ আর জন্তুজানোয়ার আঁকা থাকে, সেরকমই অনেকটা। আমরা কাছে গিয়ে আরো খুঁটিয়ে দেখতে চাইছিলাম। চঞ্চলদা মানা করল। বললো,''টর্চের ব্যাটারি পুড়িয়ে কি লাভ? কাল সকালে দেখলে ভালো হয়না?''

আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। কনকনে ভেজা ঠাণ্ডায় আরাম করে গরমগরম খিচুড়ি খেলাম। পুরোহিতও আমাদের সঙ্গে বসে প্রায় আধগামলা খিচুড়ি একাই খেয়ে ফেলল। ক্লান্ত ছিলাম সবাই। শুতেই দু'চোখ জুড়িয়ে এল। স্বপ্ন দেখলাম জঙ্গল থেকে ছোট ছোট মানুষরা হামলা করেছে আর দানিকেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। হাতে বর্শা আর মাথায় পাখির পালকের অতিকায় শিরস্ত্রাণ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বৃষ্টির আওয়াজে। তাঁবুর বাইরে এসে দেখি আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমেছে। সত্যদা একটা পাথরের উপর গমভীর মুখে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। চঞ্চলদা আমাকে দেখে বললো, '' অতনু উঠেছে?''

''না, ঘুমোচ্ছে। দানিকেন কেমন আছে?''

''সুবিধের নয়। পা-টা ফুলেছে। থাঙ্গা আর পুরোহিত হাড় জোড়া পাতা খুঁজতে বেরিয়েছে। একটু চা করবি?

''এক্ষুনি চা চাপাচ্ছি। ক'টা বাজে এখন? আকাশ দেখে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।''

''সাড়ে সাতটা ---- কখন যে বৃষ্টি থামবে? অসময়ে এরকম বৃষ্টি----''

দুপুর তিনটে নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরল। তারপরে আর বেরোনোর মানে হয়না। দানিকেন এখন ভালো আছে। স্হানীয় লতাপাতার রসে ফোলা আর ব্যথাটা একটু কমেছে। সত্যদা ঠিক করলেন আজ রাতটা এখানে থেকে কাল ভোরে রওনা দেব।

আপাতত আমরা সবাই মনোলিথ আর মিলিনের গুহা দেখতে গেলাম। দানিকেন তাঁবুতে রয়ে গেল। পুরোহিত আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

টিলার ওপরে একটা গম্বুজের মতন দেখাচ্ছিল মনোলিথটাকে। কাছে গিয়ে আমরা ভালো করে দেখলাম। তিন মিটার মতন উঁচু হবে, চওড়াতেও মিটারদুয়েক মতন। চেহারা দেখে অনেক পুরানো মনে হল। মানুষ আর জানোয়ারের খোদাই করা মূর্তি তো কাল রাতেই দেখেছিলাম। আজ চোখে পড়ল সবার ওপরে একটা সূর্য, একটা তারা আর একটা চাঁদ খোদাই করা আছে। তলায় উঁচু বেদীতে একটা মানুষ, তার আকৃতি নীচের মানুষগুলোর চাইতে অনেক বড়। তার মাথায় ঢেউখেলানো লম্বা চুলের আভাস পেলাম। তার তলায় শিকার দৃশ্য, নাচের দৃশ্য--- এসব তো আছেই। লতাপাতার ডিজাইনগুলো ঠিক ভারতীয় নয়, চৈনিকও নয়। চারটে পাখি বড় করে খোদাই করা। পাখিটার লম্বা লেজ দেখে মনে হল ড্রংগো জাতের পাখি। বাংলায় আমরা বলি ভীমরাজ।

পুরোহিত মাথা নীচু করে বিড়বিড় করে একটানা মন্ত্র পড়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ মন্ত্র পড়া থামিয়ে থাঙ্গাকে কিছু বলল। থাঙ্গা আমাদের জানালো যে ওটা ওদেরই আদিপুরুষদের বানানো শিলাপাথর। এটাকে ওরা পুজো করে।

টিলার ওপরে একটা গম্বুজের মতন দেখাচ্ছিল মনোলিথটাকে।

‘‘ আদিপুরুষ মানে? থাঙ্গা, পুরোহিত কি মিজো ক্রিশ্চান নয়?’’

এবারে আমরা তাকালাম পুরোহিতের দিকে। সে মাথা নাড়ছে। থাঙ্গা বলল,‘‘ও বলছে ওরা পুরোপুরি মিজো নয়। ওদের মায়ের দিক থেকে অন্য জাতের রক্ত আছে ওর মধ্যে। সে জাতি মিজো নয়, ক্রিশ্চানও নয়।

আমরা আবার ভালো করে দেখলাম তাকে। চোখটা পুরোপুরি পটলচেরা নয়। বরঞ্চ বড় বড়। চুলও এদের মতন খাড়া-খাড়া খোঁচা খোঁচা নয়,বরঞ্চ ঢেউ খেলানো।

‘‘মিজো,কিন্তু মিজো নয়’’ .... সত্যদা বিড়বিড় করে বলে উঠল।

‘‘চলো আগে মিলিয়েনের গুহা দেখে আসি। সেখানে অনেক পুরানো দিনের কঙ্কাল আর হাড়গোড় পাওয়া গেছে শুনেছি...’’ চঞ্চলদা হঠাৎ করেই আমাদের তাড়া দিল।

মিলিয়েনের গুহা বেশি দূরে নেয়। গাছপালা ও পাহাড়ের মধ্যে হঠাৎ করে চ্যাটালো জায়গা। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। কয়েকশো বছরের পুরানো বাতাস,জৈবপদার্থ আর বাদুরের চিমসে গন্ধ মিলিয়ে একটা বিচ্ছিরি অবস্থা। টর্চ মেরে দূরে সাদাসাদা হাড়গোড় অবশ্য চোখে পড়ল।

এরপর আর ঢোকা যাবে না, গলিটা সরু হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। চঞ্চলদা বলল, ‘‘আর ঢোকার মানে হয় না। এটা নিয়ে রোজিকাসাহেব আর বাপীদার সঙ্গে কথা হয়েছে। পণ্ডিতরা এসব হাড়গোড় মেপেজুকে দেখেছেন; বলেছেন এসব অনেক পুরানো। যাদের হাড়, তারা বর্তমান স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাইতে অনেক আলাদা। এরা ছিল দীর্ঘকায়,দীর্ঘনাসা আর কোঁকড়ানো

কেশযুক্ত মানুষ। বর্তমান জনগোষ্ঠী আসার অনেক আগে থেকেই এরা এখানে থাকত। স বত এই গুহায় এদের মৃত্যুর পর নিয়ে আসা হত...সত্যদা আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। এই মিলিয়েনের গুহা কিংবদন্তীর নয়। প্রমাণ তো দেখছোই। এরাই সেই হারানো মানবদের সূত্র।''

ক্রমশ

ছবি : মৌসুমি

মি: জন হাচিনসন বাজার করে ফেরবার পথে মাথায় বাজ পড়ে মারা গেছেন। মৃতদেহকে কফিনে রেখে গোরস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। সাহেবদের দেশে কেউ মারা গেলে টাকার বিনিময়ে মৃতের গোর দেবার সব বন্দোবস্ত করে যারা তাদের বলে আন্ডারটেকার। তা, গোর দেবার জন্য কবর খুঁড়ে তাতে কফিন নামিয়ে শেষবারের মতো তাঁকে একবার দেখাবার জন্য কফিনের ডালা খুলতে মিসেস হাচিনসন চমকে উঠলেন। তাঁর স্বামীর গায়ে বাজ পড়ে মরবার সময়কার সেই হলদেটে রঙের কোটটাই রয়ে গেছে। রেগেমেগে আন্ডারটেকারকে ডেকে তিনি বললেন, ''কর্তা বলতেন তাঁকে যেন তাঁর নীল রঙের নতুন স্যুটটা পরিয়ে গোর দেয়া হয়। স্যুটটা তখন আমি আপনাকে দিয়েও দিলাম সেইজন্য, অথচ এখন দেখছি আপনি সেটা ওঁকে পরান নি। এক্ষুণি পালটে দিন।''

আন্ডারটেকার ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে ক্ষমাটমা চেয়ে বললেন, ''স্যুটটা আপনাকে ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি ম্যাডাম। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু আর মাত্র সামান্যই সময় বাকি। এই সময়ে আবার ওঁকে বের করে এনে স্যুট পালটানো----''

মিসেস হাচিনসন রেগে উঠে বললেন, ''তাহলে আপনার পেমেন্টটাও কিন্তু আটকে দেবো এই বলে দিলাম।''

কি আর করা। আন্ডারটেকার ভদ্রলোক কফিনটা তুলে নিয়ে মৃতদেহ রাখবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঠিক তিন মিনিটের মাথাতেই ফের বেরিয়ে এলেন কফিন নিয়ে। দেখা গেল এইবারে মি: হাচিনসন তার মধ্যে পরিপাটি নীল রঙের স্যুট পরেই শুয়ে রয়েছেন।

খানিক বাদে সব মিটে টিটে গেলে, টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে মিসেস হাচিনসন আন্ডারটেকারকে বললেন, ''আপনি কিন্তু খুব দক্ষ মানুষ। এত তাড়াতাড়ি ওঁর পোশাক পাল্টে আনলেন, ভাবাই যায় না। কী করে করলেন বলুন তো?''

আন্ডারটেকার ভদ্রলোক ততক্ষণে তাঁর গাড়িতে উঠে বসেছেন। চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি গিয়ারে ফেলতে ফেলতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ''খুবই সহজ কাজ ম্যাডাম। মৃতদেহ রাখবার ঘরে একটা নীল স্যুট পরা বেওয়ারিশ মরা পড়ে ছিলো। আমি শুধু মুণ্ডুদুটো বদলে দিয়েছি। আচ্ছা চলি--''

উল্টো মানুষ

প্রমণা চট্টোপাধ্যায়। বয়স : দশ
ষষ্ঠ শ্রেণী, শিবপুর হিন্দু হাই স্কুল

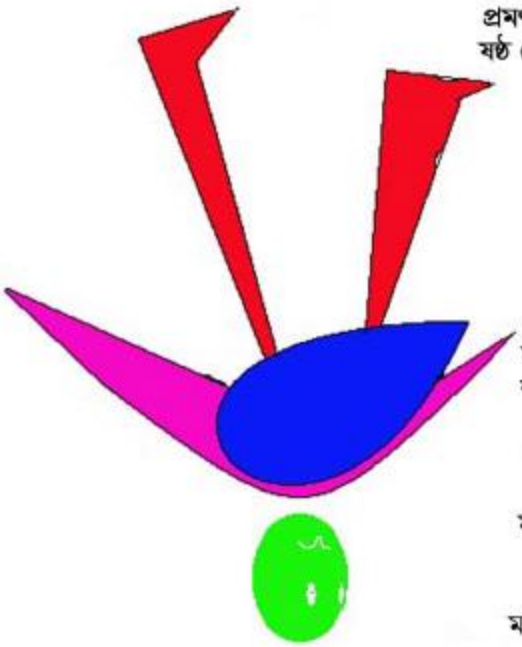

রাত্রে মানব স্বপ্ন দেখে,
সকালে দেখে স্কুল,
রবিবারে দেখতে থাকে,
ফুলের গাছের ফুল।

গ্রীষ্ম প্রখর রোদে মানুষ
ছটফটিয়ে ওঠে,
মানব কিন্তু সেই সময়েতে
শীতে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

শীতকালেতে সবাই যখন
সোয়েটার পরে থাকে,
মানব তখন গরমের চোটে
বরফ ঢোকায় নাকে।

মানবের মতো উলটো মানুষ
কখনো কেউ দেখেছ?
দেখলে বুঝো তুমিও একটা
উল্টোনো কাজ শিখেছ।

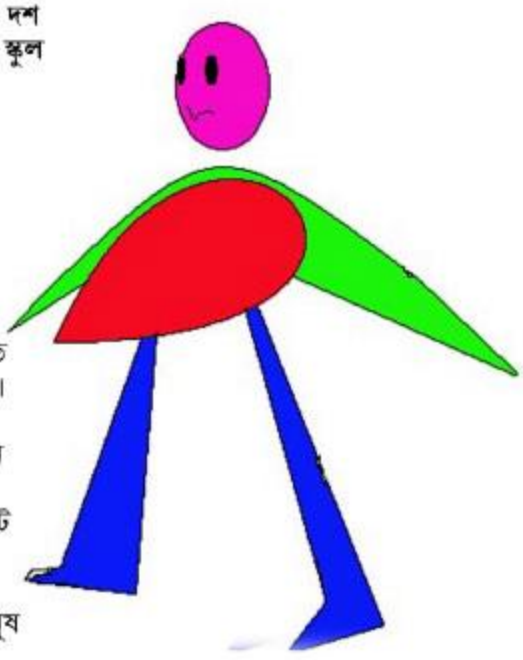

কার্টুন

মঞ্জিমা গুহ মজুমদার (ক্লাস টু,বয়স আট)

একদিন আমি স্কুলের থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা কিসের শব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি একটা কার্টুন এইদিকে আসছে। আমি তো ভাবতেই পারছি না যে,আমাদের পুরুলিয়াতে,কার্টুন আসবে। টিভিতে তো আমরা কার্টুন দেখি।ও কি করে আমাদের এখানে এল?

আমি বাড়ি ফিরে মাকে সব বললাম। মা তো আমার দিকে তাকালোই না। কিছু শুনলো বলেও মনে হল না। তাই কোন উত্তরও দিল না। সোজা রান্না ঘরে চলে গেল। এদিকে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। পরের দিন স্কুলে গিয়ে ম্যাডামকে সব বললাম। এই কার্টুনটাকে তো আমরা টিভিতে দেখি,এর মালিক কলকাতাতেই থাকে। তাহলে তাকে গিয়ে সব কথা বলতে হয়। এদিকে রোজই স্কুলে যাওয়া-আসার পথে কার্টুনটা আমার পেছন পেছন যাওয়া-আসা করছে। আমার দিকে তাকিয়েও থাকে।

আমাদের স্কুলে কটা বীর পালোয়ান ছেলে আছে। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি এই ছেলে গুলো কার্টুনটাকে ধরে খুব মারধোর করছে।আমি তো ছুটে গেলাম। দেখি কি কার্টুনের গলায় একটা মালা।আমি যেই মালাটা ধরে টান দিলাম মালাটা ছিঁড়ে পড়ল। ও মা, তক্ষুনি কার্টুনটা একটা সুন্দর

পরী হয়ে গেল।আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। পরী বললো ও একটা পেত্নীবুড়ির খুব ক্ষতি করেছিল বলে পেত্নীবুড়ি ওকে মালাটা পরিয়ে একটা কার্টুন বানিয়ে দিয়েছিল। পরী জানতো যে আমার মতন কোন বাচ্চা মেয়ে ওর এই মালাটা খুলে দিলে তবেই ও আবার পরী হতে পারবে। তাই বেচারি আমাদের স্কুলে যাওয়া-আসার পথে দাঁড়িয়ে থাকতো।

পরী আমাকে খুব ভালোবাসলো। বাড়ি গিয়ে মাকে সব বললাম। এবার মা আমাকে জড়িয়ে ধরলো আর খুব আদর করলো।

ছবি মহাশ্বেতা

গ্যালারি

গ্রামের ছবি আঁকতে বলেছিলাম এবারে। তাতে আনন্দমোহন, বউল আর বিনি মানে শময়িত্রী তো ঠিকঠাক গ্রামের ছবি এঁকে নিয়ে এলো, কিন্তু পাখি, মানে অম্বিকা দেখি এক ভয়ানক ভ্যামপায়ারের ছবি এঁকেছে। বললাম, এটা কি গ্রামের ছবি হল?
জবাবে সে বলল, নিশ্চয়। এটা তো আমার গ্রামের বাড়ির পোষা ভ্যামপায়ারের ছবি!

অম্বিকা রায়চৌধুরি, বয়সঃ ৬, গ্রামার স্কুল, ভোপাল

আনন্দমোহন ১০ বছর দমদম

শময়িত্রী দেবনাথ কেজি টু বারাকপুর

বউল, নৈহাটি

পুরাণ কথা

একটি বন্ধুত্বের গল্প

টুপুর

ঋষি ভরদ্বাজের সন্তান ছিলেন কৌরব অস্ত্রগুরু দ্রোণ। দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন তাঁর বাবার ছাত্র ঋষি অগ্নিবেশের কাছে। ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমেই ব্রহ্মচর্যের সময় তাঁর খেলার সাথী ছিলেন তাঁর পিতৃবন্ধু পাঞ্চালরাজের পুত্র দ্রুপদ। দ্রুপদ আবার দ্রোণের সাথে পড়াশোনাও করতেন।

তারপর বড় হয়ে দ্রুপদ, রাজ্যভার নিতে চলে গিয়েছিলেন উত্তর পাঞ্চাল দেশে। অস্ত্রবিদ্যা সমপূর্ণ রপ্ত করে দ্রোণ গৃহি হয়েছিলেন গোতম মুনির মেয়ে কৃপীকে বিয়ে করে। কিছুকাল পরে তাঁদের ঘর আলো করে জন্মান অশ্বত্থামা। এমন সময় দ্রোণ জানতে পারেন যে ঋষি জমদগ্নি তার যাবতীয় জাগতিক শক্তি, সমপদ, অস্ত্র, জ্ঞান বিলিয়ে দিচ্ছেন ব্রাহ্মণদের। তিনি কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে। তিনি যখন পৌঁছলেন ঋষির কাছে তখন ঋষির পুঁজিতে অবশিষ্ট আছে তাঁর অস্ত্র এবং তাঁর দেহ। তিনি দ্রোণকে এই দুইয়ের মধ্যে বাছতে বললেন। অস্ত্র এবং অস্ত্রবিদ্যার আকর্ষণে দ্রোণ ঋষি জমদগ্নির যাবতীয় অস্ত্র এবং সেই সব অস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল চেয়ে নিলেন।

এইভাবে জগতের সেরা অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে দ্রোণ গেলেন দ্রুপদের কাছে তাঁদের বাল্য সখ্যতার কথা মনে করে। পাঞ্চাল রাজা দ্রোণের বন্ধুত্ব অস্বীকার তো করলেনই তার সাথে ধন-মান-জন্ম সবকিছুর তুলনায় দ্রোণকে হেয় এবং বন্ধুত্বের অযোগ্য প্রতিপন্ন করলেন। দ্রোণকে তীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় জানিয়ে দিলেন যে বন্ধুত্ব, এবং শত্রুতাও, হয় কেবলমাত্র সমানে সমানে। দ্রোণ খুব আহত হলেন এই অপমানে। তিনি কুরু রাজধানী হস্তিনাপুরে চলে গেলেন। তাঁর আত্মীয় কৃপের আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। সেখানে কৃপের শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন।

এই সময়ে একদিন কুরু রাজপুত্ররা খেলতে খেলতে শহরের বাইরে চলে এলেন। কিছুক্ষণ পরে তারা যে বলটা নিয়ে খেলছিলেন সেটা একটা শুকনো কুয়োয় পড়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা বলটা কিছুতেই কুয়ো থেকে তুলতে পারলেন না। সেই সময়ে সেখান দিয়ে দ্রোণ আসছিলেন কোথাও থেকে। কুরু রাজপুত্রদের দেখে তিনি ঠাট্টা করে বললেন, ''তোমরা একটা বল তুলতে পারছ না? আমি তো বল কেন আংটিও টেনে তুলে দেব কুয়ো থেকে, যদি আজ রাতে আমাকে রাজভোগ খাওয়াবে বলো।'' বলেই দ্রোণ নিজের নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে সেই শুকনো কুয়োয় ফেলে দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, ''আপনি তো খুবই সামান্য প্রত্যাশার কথা বলছেন, ব্রাহ্মণ। যা বলছেন সত্যি যদি তা করতে পারেন তাহলে আপনি, কৃপের অনুমতি নিয়ে, আমাদের থেকে এমন কিছু নিতে পারেন যা আপনার সারাজীবন কাজে লাগবে।'' উত্তরে দ্রোণ বললেন, '' মন্ত্রপূত ঘাসের শিষ বলের গায়ে গেঁথে তারপর তার সাথে আরেকটা ঘাসের শিষ, সেই শিষের সাথে আরেকটা শিষ এরকম করে একটার

পর একটা শিষ গেঁথে শিকল বানিয়ে সেই শিকল টেনে বলটা তুলে নেব।'' এই বলেই তিনি একমুঠো ঘাসের শিষ নিয়ে মন্ত্র বললেন। তারপর যেমনটা বলেছিলেন তেমনটাই করলেন। শুকনো কুয়ো থেকে উঠে এলো বল। তখন মুগ্ধ কুরুকুমারেরা বলতে লগলেন, ''আংটিটাও এখনই তুলে আনুন।'' দ্রোণও তখনই ধনুকে তীর লাগিয়ে ছুঁড়লেন শুকনো কুয়োর তলায়, তীর আংটিতে বিঁধল যেই অমনি আংটিটা দ্রোণ তুলে এনে রাজকুমারদের হাতে দিলেন। অবাক যুধিষ্ঠির বললেন, ''কী আপনার পরিচয়? আমরা আপনার কোনো সেবায় লাগতে পারি?'' উত্তরে দ্রোণ শুধু অনুরোধ করেছিলেন যে রাজপুত্ররা যেন ভীষ্মকে পুংখানুপুংখ জানান যা তাঁরা চাক্ষুষ দেখলেন।

কুরু রাজকুমারদের থেকে সব শুনে ভীষ্মের বুঝতে ভুল হলো না যে রাজকুমারদের সাথে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রজ্ঞ দ্রোণের দেখা হয়েছে। তিনি নিজে গিয়ে দ্রোণকে অনুরোধ করলেন কুরুকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার জন্য। তখন দ্বিধার সঙ্গে দ্রোণ খুব দু:খের সব অভিজ্ঞতা বললেন।

তিনি যখন ঋষি অগ্নিবেশের আশ্রমে ব্রহ্মচারী এবং অস্ত্রবিদ্যার পাঠ নিতেন তখন সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন পাঞ্চাল রাজপুত্র যজ্ঞসেনা (দ্রুপদ)। তিনি দ্রোণের প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। তিনি এতো ভালোবাসতেন দ্রোণকে যে প্রায়ই বলতেন, ''আমি বাবার প্রিয় সন্তান; বাবা আমাকে রাজত্বে অভিষিক্ত করলেই আমি যা কিছু পাব সে সবই তোমারও হবে।'' তারপর পড়াশোনার পাট মিটলে তিনি নিজের দেশে ফিরে যান। তারও বেশ কিছুদিন পর দ্রোণ কৃপির সাথে সংসার পাতেন। অশ্বত্থামা জন্মায়, বড় হতে থাকে। একবার এক ধনবান পরিবারের একটি ছেলেকে দুধ খেতে দেখে অশ্বত্থামা দুধ খেতে চায়। দ্রোণ তখন দিশেহারা হয়ে দেশে দেশে দুধের সন্ধানে ঘুরে বেরিয়েছেন। দু:খ এবং অভাবে তাঁর বোধ এতটাই আচ্ছন্ন ছিল সে সময় যে তিনি গোশালার মালিকের থেকে দুধেল গাই না চেয়ে যার কাছেই একাধিক গরু দেখেন তার থেকেই গরু চেয়ে বসেন। কিন্তু এইসব গরুর মালিকরা দ্রোণকে গাইগরু না দিলে ধর্মচ্যুত হতেন, অথচ সে সময়ে তাঁদের কাছে উৎসর্গ করার মতো দুধেল গাই ছিল না। ফলে অনুসন্ধান শেষে দ্রোণ খালি হাতে ফেরেন। সে সময়ে অশ্বত্থামার কয়েকজন খেলার সঙ্গী চালগুঁড়ো জলে গুলে পিটুলি বানিয়ে অশ্বত্থামাকে খেতে দেয় এবং বলে যে ওটাই দুধ। আগে কখনও দুধ না খাওয়ায় অশ্বত্থামা জানতেন না দুধের স্বাদ। তিনিও পিটুলি খেয়েই আনন্দে নেচেছিলেন, ''আমি দুধ খেয়েছি, আমি দুধ খেয়েছি,- - -'' বলে। চারদিক থেকে দ্রোণের কানে আসতে জ্ঞানী কিন্তু দরিদ্র দ্রোণের নামে চলতে থাকা ছিছিক্কার। তখন আরও বেশি জেদ চেপে যায় দ্রোণের যে ব্রাহ্মণরা তাঁকে জাতিচ্যুত কিংবা ধর্মচ্যুত করলেও তিনি কখনও ঐশ্বর্য কামনায় কারও চাকরি করবেন না। তখন তাঁর মনে পড়ে বাল্যবন্ধু

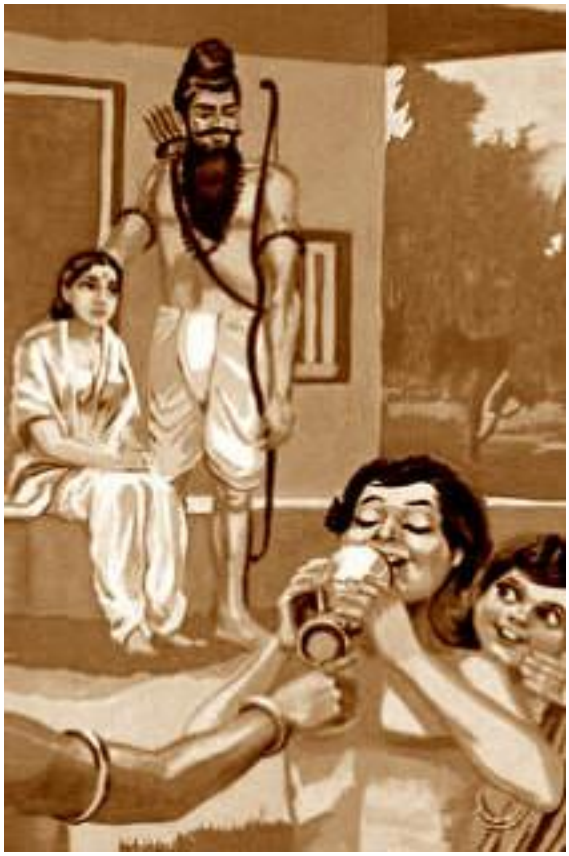

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কথা। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তিনি পৌঁছন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে, সসম্মানে বাঁচার আশায়। কিন্তু সেখানে স্ত্রী-পুত্র সমেত প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি চলে এসেছেন কুরু বংশের আশ্রয়ে, সুযোগ্য শিষ্যত্বে কুরুকুমারদের গড়ে তুলবেন বলে।

তারপর খুব যত্নে কুরুকুমারদের অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুললেন তিনি। শেষে একদিন এলো তাঁর গুরুদক্ষিণা চাওয়ার সময়। তিনি চাইলেন পাঞ্চাল রাজ্য ও দ্রুপদের বন্দীত্ব। প্রথমেই কর্ণসহ দুর্যোধনেরা একশ ভাই অতর্কিত আক্রমণে অপ্রস্তুত পাঞ্চালরাজকে পর্যুদস্ত করে তুললেন। কিন্তু বীর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ততক্ষণ কুরুবহিনীকে একলা রুখলেন যতক্ষণ না তাঁর বীর সেনাপতি সত্যজিৎ সেনাবাহিনী নিয়ে পৌঁছলেন। পাঞ্চালসেনার আক্রমণে কুরুকুমাররা পিছু হঠলেন একসময়। তখন শুধু অর্জুন এবং ভীম পুরো পাঞ্চালসেনাকে পর্যুদস্ত করলেন। সেনাপতি সত্যজিতকে অর্জুন এমন আহত করলেন যে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে হলো। তারপর দ্রুপদকেও হারিয়ে বন্দি করে আনলেন দ্রোণের কাছে।

দ্রোণ দ্রুপদের কাছে শর্ত রাখলেন যে দ্রুপদ যদি দ্রোণকে বন্ধু বলে মেনে নেন তাহলে পাঞ্চালরাজ্যের অর্ধেক দ্রোণ তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন। বলাবাহুল্য, দ্রুপদ রাজা অর্ধেক রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলেন, আর দ্রোণ ফিরে পেয়েছিলেন বন্ধুত্বের স্বীকৃতি।

রাশিয়ান গল্প

রাজপুত্র ইভান ও ধূসর নেকড়ে

আই কারনখোভা
অনুবাদ : ইন্দ্রশেখর
মূল প্রকাশনা: ম্যালিশ প্রকাশনী, মস্কো

আগে যা হয়েছে: *রাজার বাগানের আপেলচোর আগুন পাখির খোঁজে বেরিয়ে নেকড়ের সাথে ভাব হলো ছোট রাজপুত্র ইভানের। তার পিঠে চেপে সাইমন রাজার দেশ থেকে আগুন পাখি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল সে। তারপর সাইমনের কথায় সোনালি কেশরের ঘোড়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল আগাপ রাজার হাতে। আগাপ রাজা তাকে মাপ করবার শর্ত দিলেন, পৃথিবীর শেষপ্রান্তের রাজকন্যা ইয়েলেনাকে এনে দিতে হবে। ইয়েলেনার প্রাসাদের কছে গিয়ে নেকড়ে চুরি করে আনল ইয়েলেনাকে। তারপর--*

দ্বিতীয় পর্ব

নেকড়ের পিঠে চেপে ইয়েলেনাকে কোলে নিয়ে বসল ইভান। বিদ্যুতের মত উড়ে চলল নেকড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে ঢুকল আগাপ রাজার দেশে। রাজকন্যাকে ছাড়তে মোটে মন চাইছিল না ইভানের। কিন্তু কী করে? সে তো আগাপ রাজাকে কথা দিয়ে এসেছে! এইসব কথা ভাবছে ইভান এমন সময় একটা ছোট্ট নীল পাখি তার কাছে উড়ে এসে বলল, ''শোন রাজপুত্র, আগাপ রাজা ঠিক করেছে রাজবাড়ির উঠোনে তোমায় মেরে ফেলে তারপর ইয়েলেনাকে বিয়ে করবে।''

''তাই নাকি? তবে তো রাজাকে শিক্ষা দিতে হয়!'' এই বলে রাগে গরগর করতে করতে নেকড়ে ফের বলল, ''চলো ইভান, আমরা সোজা রাজবাড়িতে যাব। আর ইয়েলেনা, তুমি আমার পিঠ থেকে নেমে এইখানটায় একটু দাঁড়াও দেখি! যতক্ষণ না আমরা ফিরে আসি, কোথাও যেও না কিন্তু।''

এই বলে মাটির গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল নেকড়ে। উঠে যখন দাঁড়াল তখন তাকে দেখতে হয়েছে ঠিক যেন রাজকন্যা ইয়েলেনার যমজ বোনটি! ইভান তার হাত ধরে প্রাসাদের দিকে রওনা হল। আসল ইয়েলেনা রয়ে গেল গাছতলায়।

নকল ইয়েলেনাকে আসতে দেখে আগাপ রাজা ভারি খুশি হয়ে দৌড়ে এসে বলে, ''এসো রাজকন্যা, এসো। আর ইভান, তুমি এবারে সোনালি কেশর ঘোড়াকে নিয়ে যেতে পারো।''

মুখে সে কথা বললে কী হবে, রাজার মনে মনে কিন্তু অন্য ফন্দি ছিল। সেপাই সান্ত্রীদের দিকে ফিরে সে চুপি চুপি কী এক ইশারা করতেই তারা তলোয়ার উঁচিয়ে তেড়ে গেল ইভানের দিকে। ইভান তো এরকমটা হতে পারে ভেবে আগে থেকেই তৈরি ছিল। সেপাইরা তাকে ধরবার আগেই সোনালি কেশরের ঘোড়ার পিঠে উঠে সে দিয়েছে ঘোড়া ছুটিয়ে। সেপাইরা তার পিছু ধাওয়া করবার আগেই রাজকন্যা ইয়েলেনা মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছে, আর তার জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট নেকড়ে বাঘ। তাই দেখে রাজা তার সেপাই সান্ত্রী নিয়ে দে ছুট। আর নেকড়েও দৌড়ে গিয়ে গাছতলায় রাজকন্যা ইয়েলেনার কাছে গিয়ে উঠেছে। ততক্ষণে ইভানও পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। তাড়াতাড়ি সোনালী কেশরের পিঠে রাজকন্যাকে বসিয়ে নিয়ে ইভানকে পিঠে করে তারা এবারে রওনা হল সাইমন রাজার দেশের দিকে।

সেখানে পৌঁছোতে না পৌঁছতে নীল পাখি এসে বলল, ''রাজা ঠিক করেছে ঘোড়া কেড়ে নিয়ে তোমায় মেরে ফেলবে ইভান।''

তাই শুনে নেকড়ে সাজল সোনালি কেশর ঘোড়া। তারপর রাজকন্যা আর আসল সোনালী কেশর-কে বাইরে রেখে ইভানকে নিয়ে সে চলল রাজদরবারে। ঘোড়া দেখে রাজা বেজায় খুশি হয়ে ইভানের হাতে দিল আগুন পাখির খাঁচা। তারপর আড়ালে সেপাইসান্ত্রীদের ডেকে যেই না ইশারা করেছে, ওমনি ঘোড়া হয়ে গেল বিরাট এক নেকড়ে। রাজা আর তার সেপাইসান্ত্রীরা ভয়ের চোটে

পালিয়েই গেল। তখন আগুন পাখির খাঁচা হাতে ইভান চাপল নেকড়ের পিঠে আর রাজকন্যা বসল সোনালী কেশর ঘোড়ার পিঠে। সবাই মিলে ফিরে চলল তারা ইভানের দেশের দিকে। দেশের সীমানায় পৌঁছে নেকড়ে বলল, এইবারে তো বাড়ি চলে এলো ! এবারে আমায় শিকার ধরতে যেতে হবে। তোমরা এবারে একা একা যাও, কেমন!'' এই বলে ইভানকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেকড়ে হারিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর।

ইভান তার রেশমের তাঁবু খাটিয়ে তার ভেতরে ইয়েলেনাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে হয়েছে কি, ইভানের দুই দুষ্টু দাদা পিওতর আর ফিওদর ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে বেরিয়েছিলো সেদিন। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তারা দেখে বনের ধারে এক রেশমের তাঁবু খাটানো রয়েছে। তাঁবুর বাইরে মাঠের ওপর চরে বেড়াচ্ছে, সোনালী কেশরওয়ালা একটা ঘোড়া, আর তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়ে তো হিংসায় সবুজই হয়ে গেল তারা। দেখে কি, সোনার খাঁচায় আগুন পাখি বসে গান গাইছে আর ইভানের পাশে ঘুমিয়ে আছে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। দেখে ফিওদর তক্ষুণি তলোয়ার বের করে ইভানকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর রাজকন্যাকে ভয় দেখিয়ে বলল, সে যদি কাউকে কিছু বলে তবে তাকেও ওমনি

করে দু'টুকরো করে ফেলবে সে। তারপর দুই ভাই মিলে রাজকন্যা, ঘোড়া আর আগুন পাখির খাঁচা নিয়ে চলল রাজবাড়ির দিকে। ইভানের শরীরটা পড়ে রইল বনের ধারে মাঠের ওপর।

খানিক বাদে শিকার টিকার সেরে , খেয়ে দেয়ে ফিরে এলো ধূসর নেকড়ে। এসে দেখে ইভান মরে পড়ে আছে মাঠের ওপর। কেমন করে এমনটা হল সেসব খোঁজখবর নিয়ে ভারী দু:খ হল তার। ইভানের পাশে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল ধূসর নেকড়ে।

একটু বাদে হল কি, দুটো কাক উড়তে উড়তে এসে ইভানের চোখ ঠুকরে খেতে এলো। নেকড়ে ওমনি লাফ দিয়ে উঠে ছোট কাকটাকে চেপে ধরল মুঠোর মধ্যে। মা কাকটা উড়তে উড়তেই কাঁদতে লাগলো। বলে, ''আমার ছেলেটাকে ছেড়ে দিন প্রভু। তার বদলে আপনি যা চাইবেন তাই দিতে তৈরি আমি।''

শুনে নেকড়ে বলল, ''তাহলে যা, পাহাড় , সমুদ্র পার হয়ে উড়ে গিয়ে জিয়নকাঠি হ্রদের থেকে খানিক জল এনে দে দেখি আমায়!''

''তাই হবে,'' বলে মা কাক সটান উড়ে গেল পাহাড় পেরিয়ে। তিনদিন তিনরাত তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। চারদিনের দিন ফিরে এল সে। সঙ্গে তার জিয়নকাঠি হ্রদের জল। সেই জল ইভানের ওপর ছিটিয়ে দিতেই প্রাণ পেয়ে উঠে বসল ইভান। বলে, ''ইস। বড্ডো বেশি ঘুমিয়ে ফেলেছি যে!''

''ঘুমিয়েছো তো বটেই! আমি না থাকলে সে ঘুম তোমার আর কোনদিন ভাঙতো না,'' বলে উঠল নেকড়ে। তারপর তাকে সব কথা খুলে বলতে ইভান দু:খে কেঁদেই ফেলল একেবারে। তাই দেখে নেকড়ে বলল, ''আচ্ছা দাঁড়াও, ফিরে যাবার আগে তোমার আর একটা উপকার করে যাচ্ছি আমি। চলো, আমার পিঠে চাপো দেখি!''

পরদিন ভোর ভোর তারা পৌঁছে গেল ইভানের বাবার দুর্গে। সেইখানে ইভানকে নামিয়ে দিয়ে নেকড়ে বিদায় নিল তার কাছ থেকে। যাবার সময় বলে গেল, ''এইবারে আর যা করবার সেসব কিন্তু তোমাকেই করতে হবে বন্ধু। আমি আর কোন সাহায্য করবো না।

তাড়াতাড়ি দুর্গের ভেতর ঢুকে প্রাসাদের দিকে চলল ইভান। সেখানে তখন বিয়ের ঘন্টা বাজছে। রাজকন্যা ইয়েলেনার সঙ্গে রাজপুত্র ফিওদরের বিয়ে। ঘন্টার শব্দ শুনে ইভান আরো জোরে ছুটল প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে------

তারপর? রাজকন্যা ইয়েলেনা তার বন্দিশালায় বসে কাঁদছিলো। আর খানিক পরেই তার বিয়ে। এমন সময় কোথায় যেন দুপদাপ করে পায়ের শব্দ উঠল। আগুন পাখি ডেকে উঠল হঠাৎ, আর সোনালি কেশর চিঁ হি হি করে ডেকে উঠল প্রাসাদ কাঁপিয়ে। কে এল? কে এল? কে আর আসবে? হঠাৎ বন্দিশালার দরজা খুলে রাজকন্যার সামনে এসে দাঁড়াল, রাজপুত্র ইভান। তাকে দেখে রাজকন্যা হেসেকেঁদে অস্থির ।

তারপর তো ইভানের হাত ধরে রাজকন্যা সভায় এসে রাজা ভাসিলিকে সব কথা খুলে বলল। শুনে রাজা ভারি রেগে গিয়ে ফিওদর আর পিওতরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ইভান রাজকন্যাকে বিয়ে করল। তারপর রাজা , রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্র , আগুন পাখি আর সোনালি কেশরের ঘোড়া সবাই মিলে সুখে স্বচ্ছন্দে রইল।

আমার কথাটি ফুরুল।

ছবি: দীপংকর

পুরাতনী

দিলীপ রায়চৌধুরী

(বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞানের গল্পের প্রকৃত জন্ম হয়েছিলো তিন বন্ধুর চেষ্টায়। তাঁরা হলেন সত্যজিত রায়, অদ্রীশ বর্ধন ও দিলীপ রায়চৌধুরি। তাঁরা তৈরি করেছিলেন বাংলাভাষায় পুরোদস্তুর (এবং সমভবত এখনও একমাত্র) সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন 'ফ্যানটাসটিক'।

চল্লিশে পা দেবার আগেই মারা যান দিলীপ রায়চৌধুরী। তার আগে যে কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেগুলো আমরা একে একে জয়ঢাকের পাতায় প্রকাশ করবো এবারে। প্রথম বের হয়েছিলো 'নেরগাল', গত পুজোয়, আর এইবারে বের হল 'প্লুটোর অভিশাপ'। প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাঁর মেয়ে, তোমাদের যশোধরাদিদি---সমপা:)

ভোর চারটেয় উঠতে হয়। এরকম কড়া ডিসিপ্লিন সৈন্যবাহিনী ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাবে না। অথচ আমরা সেন্ট জেমস কলেজের ছাত্র। অপরাধের মধ্যে এন সি সি-তে নাম লিখিয়ে বড়দিনের ছুটিতে রূপশীলায় ক্যামপে এসেছি। সঙ্গে অধ্যাপক সুশোভন রায়। ভদ্রলোক কড়া ক্যাথলিক পাদ্রিদেরও এক কাঠি ওপরে যান। পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। এই শীতে ভোর বেলায় উঠে ঠান্ডা জলে চান করতে হবে। তারপর জামাকাপড় পরে মাইল তিনেক দৌড়। তারপর ফিজিক্যাল ট্রেনিং। রোদদুর উঠলে প্রাতরাশ সেরে জিওলজির স্পেশাল ক্লাস- যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। এছাড়া প্রায়ই বিকেলের দিকে ওঁর সঙ্গে মাইলের পর মাইল পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে পাথর চিনতে হয়।

ছাত্রদের মধ্যে ওঁর সবচেয়ে প্রিয় অমরেশ। জিওলজিতে ওর মত চৌখশ ছেলে খুব বেশি নেই। আর আমাদের মাথায় ঐ পাথরগুলো দিয়ে গুঁতো মারলে ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমার টিকিট প্রভৃতি নানারকম জিনিস বেরোবে কিন্তু জিওলজি - নৈব নৈব চ!

রূপশীলা জায়গাটা ভূবিজ্ঞানীদের স্বর্গ বললেই চলে। কত অসংখ্য রকমের যে পাথর এখানে আছে তার হিসাব করবে কে? গ্রানাইট, মার্বেল, কোয়ার্টজ কী নেই এখানে! কিন্তু কাঁহাতক আর ভাল

লাগে গ্রানাইটের উৎপত্তির ইতিহাস এই পান্ডব-বর্জিত তেপান্তরে? মন পড়ে আছে ডিসেম্বরের কলকাতায় - ময়দানে এখন এম সি সি বনাম ভারত ক্রিকেট চলেছে।

সেদিন বিকেলেও আমরা যথারীতি সুশোভনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি। দলের মধ্যে আমি আর অমরেশ ওঁর কাছে রয়েছি। বাকি সকলে একটু পিছিয়ে পড়েছে। অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না- শরীর বলে তো একটা জিনিস আছে। সেই ভোর বেলা থেকে দৌড়চ্ছে।

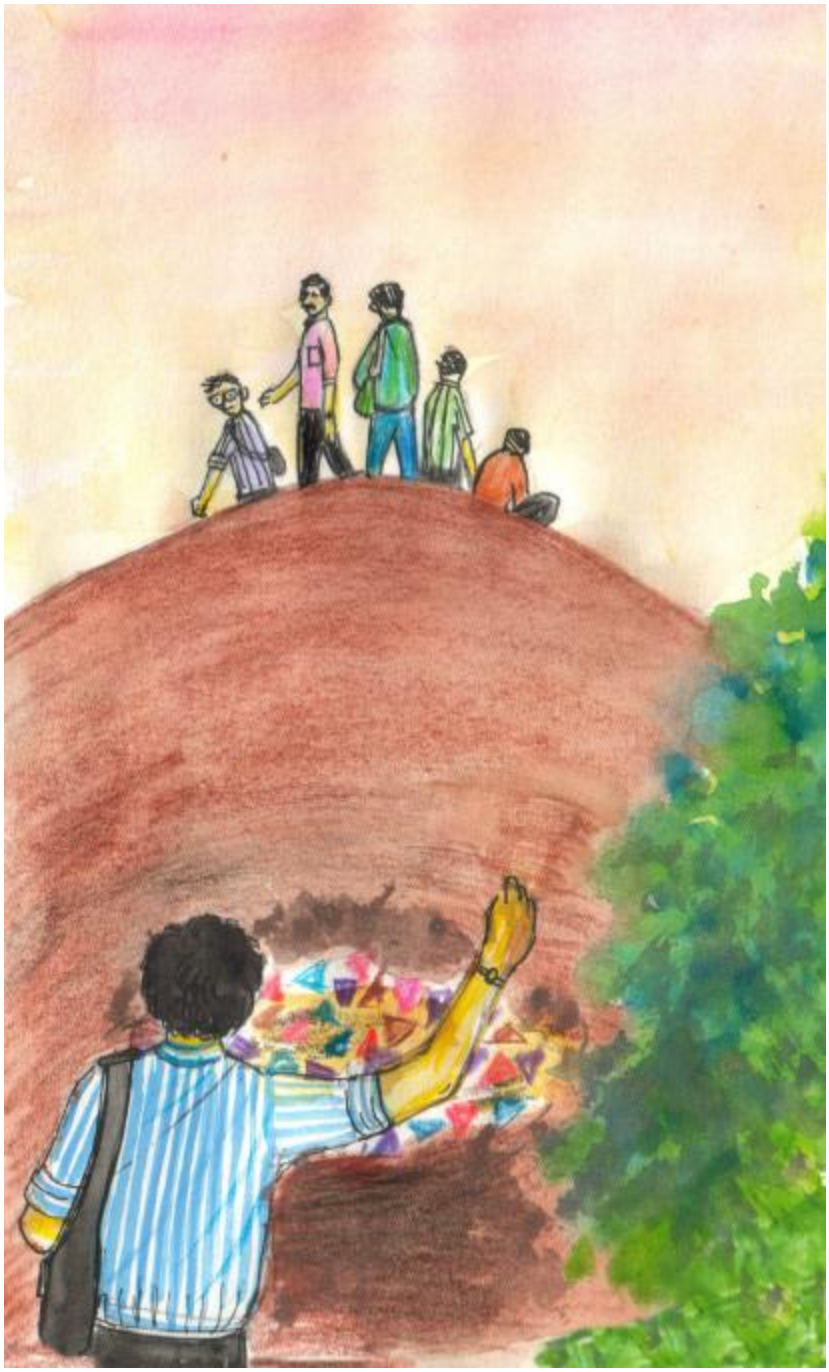

একটা খাড়া পাহাড়ি জায়গায় উঠে আমরা ধীরে ধীরে নেমে আসছি। একটু জিরোব বলে ঢালু উপত্যকার দিকে এগোচ্ছি হঠাৎ পেছন থেকে অমরেশ চিৎকার করে উঠলো,'স্যার, সাবধান! ভাঙা কাচের টুকরোয় সামনের জায়গাটা একেবারে ভর্তি।' বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি সামনে একটা গহ্বর। গহ্বরের চারিদিকে ছড়ানো অসংখ্য স্ফটিকের টুকরোর মত এক বিচিত্র খনিজ। সুশোভনবাবু খুব গমভীর মুখে এগিয়ে গেলেন। আপন মনে বলে উঠলেন, 'এগুলো কী? মনে হচ্ছে যেন টেকটাইট। কিন্তু এখানে কেন?'

টেকটাইট! আমরা তো কোন ছার, অমরেশের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওর কাছেও এটা অজানা।

সাবধানে সুশোভন বাবু ও অমরেশ গহ্বরের মধ্যে নেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওরা যেন কী সব পরীক্ষা করলো, তারপর বেশ কয়েকটা পাথরের টুকরো সংগ্রহ করে ওপরে এলো।

‘চলো, আজ ফেরা যাক। আর দ্যাখো, এই জায়গাটার একটা নিশানা রাখার বন্দোবস্ত করো, পরে আবার আসতে হবে।’

আমাদের সঙ্গে ঐ এলাকার একটা ম্যাপ ছিল। সযত্নে জায়গাটা চিহ্নিত করে রাখা হলো। তাছাড়া সেন্ট জেমস কলেজের ছোট একটা ফ্ল্যাগ জায়গাটা থেকে একটু দূরে পুঁতে রাখা হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে দলের অন্য ছেলেদের সঙ্গে দেখা হলো। তারা তখনও হাঁফাচ্ছে। আমরা ক্যামপে ফিরে যাচ্ছি শুনে সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো ‘হিপ্ হিপ্ হুররে!’ এরকম হাফ-হলিডে তো বড় একটা পাওয়া যায় না!আজ ব্যাডমিন্টন খেলা জমবে জোর।

সুশোভনবাবু ও অমরেশ ক্যামপে ফিরে চা পর্যন্ত খেলো না। উনি যে সঙ্গে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি নিয়ে ঘোরেন সে কথা আমরা ভাল করে জানতাম। দুজনে সেই ল্যাবরেটরির তাঁবুতে ঢুকে গেলো। তারপর কখন যে সূর্য পশ্চিমে ঢলে কালিঢালা অন্ধকার নামলো, রূপশীলার আকাশে তারা ফুটলো এবং রাত্তিরের খাওয়ার ঘণ্টা বাজলো, ওরা দুজনে জানতেও পারলো না।

আমি ছিলাম সে রাতের রান্নার তদারকিতে। দুটি প্রাণী সারারাত না খেয়ে থাকবে তা তো আর হতে পারে না। দুটো প্লেটে কিছু কিছু খাবার সাজিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁবুর সামনে গিয়ে ডাকলাম: ‘অমরেশ!’

ভেতর থেকে সুশোভন বাবুর গলায় আওয়াজ হলো: ‘কে সঞ্জয়? ভেতরে এসো!’

সন্তর্পণে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দেখি অমরেশ একটা টেস্টটিউবে করে কি একটা সবুজ রঙের তরল পদার্থ গরম করছে। সেটা বার্নার থেকে সরিয়ে আরেকটা কি যেন সল্যুশন মেশালো। তারপর আলোর সামনে ধরে গমভীর মুখে মাথা নেড়ে বলতে লাগলো: ‘না স্যার, এটাতেও নিকেল নেই। হলফ করে বলছি নিকেল নেই।’

‘ব্যস, এখন এই পর্যন্ত। এসো কিছু খেয়ে দেয়ে নেওয়া যাক। কই হে সঞ্জয়, কফি কোথায়? সারারাত জাগতে হবে এই হাড় কাঁপানো শীতে। কফি না হলে ত’ চলবে না।’

কাঁধে ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে দিতে দিতে বললাম: ‘সেটা আমি আগেই জানতাম স্যার। কিন্তু স্যার, ঐ কোয়ার্টজের মতো দেখতে পাথরের টুকরোয় নিকেল পাবেন ভাবলেন কি করে?’

সুশোভন বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, ‘স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। তুমি আবার এর মধ্যে মাথা ঘামাতে এলে কেন?’

স্নেহপ্রবণ মানুষ, তায় আবার শিক্ষক। পরক্ষণেই সুর বদলে বললেন, ‘হুঁ! তুমি বোধহয় ভাবছিলে এগুলো নিছক সিলিকা অর্থাৎ বালি জাতের। আসলে আমার দেখেই সন্দেহ হয়েছে এগুলো পৃথিবীর পরিচিত খনিজ নয়। এতক্ষণ ধরে আমি আর অমরেশ খাটছি এগুলো টেকটাইট কিনা প্রমাণ করবার জন্যে। ও হরি, তুমি তো আবার টেকটাইট কাকে বলে জানো না।’

এক ঢোঁক কফিতে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে সুশোভনবাবু একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তারপর শুরু করলেন, ‘পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীর বুকের ওপর প্রতিনিয়ত নানারকমের পাথরের টুকরো এসে পড়ছে। ছোট বড় উল্কা ছাড়াও গ্রহ-উপগ্রহের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন কঠিন পদার্থ প্রায়ই পৃথিবীতে ছিটকে এসে পড়ছে! একমাত্র চাঁদের উপর থেকেই লক্ষ লক্ষ টন পাথর ও মাটি পৃথিবীতে পাওয়া গেছে।’

‘পৃথিবীতে চাঁদের পাথর!’ কিরকম যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা।

‘সুশোভনবাবু আমাদের দিকে না তাকিয়ে বলে চললেন,‘ভুললে চলবে না। চাঁদের কোনও বায়ুমন্ডল নেই। মহাকাশচারী উল্কাগুলোর গড় গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় সতেরো কিলোমিটার। এই প্রচন্ড বেগে তারা যখন চাঁদের

কাছাকাছি আসে, বায়ুমন্ডল নেই বলে তাদের গতিবেগ ব্রেক কষিয়ে কমাবে কে?সেই বেগে চাঁদের বুকে উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়ে এক গহ্বরের সৃষ্টি করে এবং গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত পাথর মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে হয় সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে, না হলে পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের ভগ্নাংশের মতো পাক খেতে থাকে।

‘এই শেষের অংশগুলো পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে পৃথিবীর কাছে আসে এবং আমাদের বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উত্তাপে পাথরের উপরের স্তর গলে ফোঁটার আকারে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। ক্রমে যখন পৃথিবীর বুকের উপর পড়বার উপক্রম হয় তখন এই ক্ষুদ্র অংশগুলো একটা নির্দিষ্ট আকার নেয়। যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা গেছে কাচের বোতামের আকারে তারা মরুভূমির প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

‘পৃথিবীতে পাওয়া চাঁদের পাথরের এই বিচিত্র ভগ্নাংশগুলোকেই টেকটাইট বলা হয়। অনেক তর্কাবিতর্কের পর গত বছর অ্যামেরিকায় আমি আর প্রফেসার তাও মিলে প্রমাণ করেছি যে এগুলো চাঁদের অংশ। রাসায়নিক বিশ্লেষণে খুব বিশেষ সুবিধে হয় না। কারণ এদের গঠন পৃথিবীর পাথরের মতোই। লোহা ও নিকেল ঠিক সেইরকম পরিমাণেই আছে।

‘কিন্তু এইগুলো তবে কী? লোহা নেই, নিকেল নেই, শুধু সিলিকারও নয়। সঞ্জয়, যাও তুমি শুয়ে পড়ো। এখন আবার আমাদের কাজে নামতে হবে। বিকেলে যা সংগ্রহ করেছিলাম বোঝা যাচ্ছে সেগুলো টেকটাইট নয়। অমরেশ আবার গোড়া থেকে শুরু করো তোমার এক্সপেরিমেন্ট।’

‘স্যার, আমি থাকলে বোধ হয় ভালো হত। আমরা দুজন কেমিস্ট্রি প্র্যাক্টিক্যালে পার্টনার। আমি অমরেশকে হাতে হাতে জোগাড় করে দিতে পারবো।’

‘বেশ তুমি যদি খাটতে রাজি থাকো আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রেখো এ ব্যাপারে বাইরে আর কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করতে পারবে না।’

হঠাৎ মনে হল যেন সত্যিকার লড়াই শুরু হলো। অজানাকে জানবার জন্য মানুষের যে চিরকালের আকাংখা আমরা যেন তারই ঝোঁকে কাজ শুরু করলাম। কত অসংখ্য প্রকারের সল্যুশন দিয়ে কী যে সব টেস্ট সুশোভনবাবু ও অমরেশ করে গেল তার কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না একেবারেই। কখনো রাসায়নিক পরীক্ষা, কখনো গাইগার কাউন্টার দিয়ে কী সব তেজস্ক্রিয়ার পরীক্ষা! ক্রমে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটা কি দেড়টা হবে। হঠাৎ সুশোভনবাবু বললেন, ‘অলরাইট অমরেশ, বুঝতে পেরেছি এটা কী।’

‘বেরিলিয়াম আর সিলিকা, এ দুটো আছে এরকম কী খনিজ হতে পারে স্যার!’

‘খনিজ! তুমি এখনও ভাবছ এটি একটি খনিজ? এটা বেরিলিয়াম সিলিসাইড- কোনো মহাকাশযানের লাইনিং থেকে গলে খসে পড়ছে! দেখছো না এখনও রেডিও এ্যাকটিভ!’

কথাটা এত অবিশ্বাস্য, এত অদ্ভুত যে কয়েক মুহূর্ত আমরা স্তমভিত হয়ে বসে রইলাম। তারপর সম্বিত ফিরতেই শুনি সুশোভনবাবু বলছেন, ‘কিন্তু এই মহাকাশযান কাদের? রূপশীলায় কেন? সেই জবাব আমাদের পেতে হবে। চলো আমরা বেরোই।’

‘বেরোবেন? এই শেষ রাত্রে? কোথায়?’

‘যেখানে আমরা এই বিচিত্র কাচের মত বেরিলিয়াম সিলিসাইড কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ওরা নিশ্চয়ই আবার আসবে। বহু দূরের যাত্রী ওরা। মহাকাশে কোটি কোটি মাইল ভ্রমণের সময় মহাজাগতিক রশ্মির আঘাতে ওদের যানের লাইনিং রেডিও এ্যাক্‌টিভ হয়ে গেছে।’

কিছুটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতোই আমরা সুশোভনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে পাহাড়ি পথে চলবার কিছু উপকরণ রুকস্যাকে ভরে নিলাম। দুটো শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট ও আরো কী সব জিনিস সুশোভনবাবু নিলেন, আমাদের দেখালেন না। অন্ধকার রাত্রি তখন সবে যেন হাল্কা হয়ে আসছে।

ক্যামপ থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। ভাগ্যিস, আমরা খুব ভালো করে নিশানা রেখেছিলাম। আঁকাবাঁকা পথে হোঁচট খেয়ে মরতে হলো না। বুনো জঙ্গল, কাঁটা ঝোপের মাঝখান দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের তীব্র আলোয় পথ দেখে আধঘণ্টার মধ্যে পৌছে গেলাম ঠিক সেই পাহাড়টার পায়ের কাছে। এখন কিছুটা উঠতে হবে, তারপরেই উপত্যকায় সেই জায়গাটা----

একে একে উঠছি। শেষরাত্তিরে ঠান্ডা হাওয়ায় শিরদাঁড়া পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও শব্দ নেই। খালি আমাদের জুতোর শব্দ।

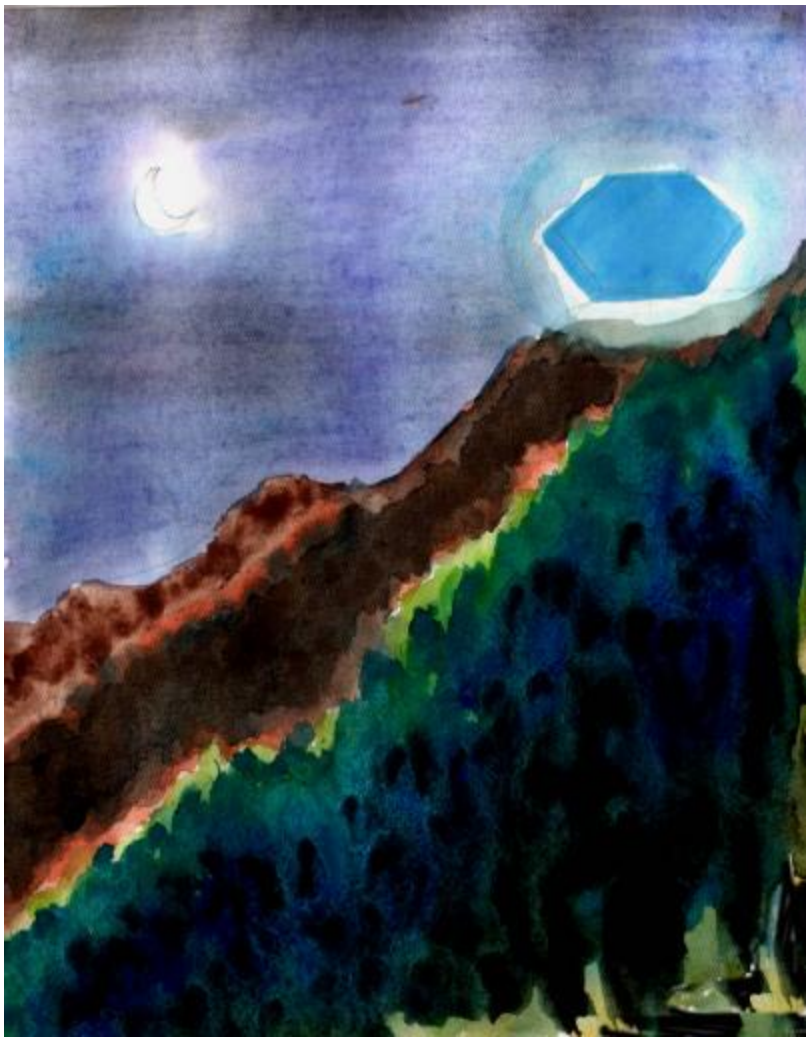

হঠাৎ কোথায় যেন একটা ক্ষীণ একটানা শব্দ পাচ্ছি মনে হলো। আমরা সকলেই উৎকর্ণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ‘স্যার কোনও আওয়াজ পাচ্ছেন? ওটা কিসের আওয়াজ?’ সুশোভনবাবু ততক্ষণে প্রায় চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। আমার কথা শুনে উত্তেজিতভাবে বললেন: ‘সাইলেন্স সঞ্জয়, দে আর হিয়ার।’

পাহাড়ের মাথায় উঠে মনে হল আওয়াজটা যেন বৈদ্যুতিক জেনারেটারের মত জোর হয়েছে। উপত্যকায় তাকিয়ে দেখি ছ’কোণা একটা নীলাভ কৃস্ট্যালে গড়া বিচিত্র চ্যাপ্টা উড়োজাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকেই আওয়াজটা আসছে। যন্ত্রটির অপূর্ব সৌন্দর্য ও ভয়াবহতায় আমরা যেন হতবাক হয়ে গেলাম। মন্ত্রপুতের মত আমরা এগোতে লাগলাম।

'ঐ দেখ, ওরা যেন কী খুঁজছে!' সুশোভনবাবুর কথায় তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলাম ঐ ছকোণা যানটার তলা থেকে কতগুলো শুঁড় বেরিয়ে মাটির ওপর স্পর্শ করে কী যেন খুঁজছে।

আমরা এগিয়েই চলেছি। হঠাৎ খেয়াল হল, অনেক এগিয়ে পড়েছি আর কাছে যাওয়া উচিত হবে না। থামতে গিয়ে দেখি এ কী, আর থামতে পারছি না তো!

অকস্মাৎ দেখি মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। এক প্রচন্ড টানে আমাদের তিনজনের দেহ ঘাসের উপর দিয়ে কাঁটা ঝোপের উপর দিয়ে, একটা গহ্বরের মধ্যে গিয়ে পড়লো। ভেতরের ঝকঝকে নীল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আমরা কোনো কথা বলার আগেই গিয়ে পড়লাম একটা গোলাকৃতি ঘরের মধ্যে। গোটা ঘরটা যে কী দিয়ে গড়া বোঝবার উপায় নেই। মহাকাশযানটার কেন্দ্রে গিয়ে যে পৌঁছেছি তা বুঝতে পারিনি। কোথাও কেউ নেই। খালি, বিরাট একটা আলোকস্তমভের মত মসৃণ স্তমভ সেই যানটার কেন্দ্রে। তা থেকে এক আশ্চর্য নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সমস্ত জায়গাটাকে আলোকিত করে রয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে পেছনে হাঁটছি হঠাৎ পেছন থেকে একটা বিকৃত আওয়াজ এল। মনে হোল একটা অজানা ভাষায় কে কথা বলে যাচ্ছে। চমকে আমরা চারিদিকে তাকালাম। কোথাও কারো দেখা নেই। নির্জন সেই মৃত্যুপুরীতে কোথাও প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই।

বুব্‌ বুব্‌ গ্লাব্‌ গ্লাব্‌,-----

কে যেন এক অদ্ভুত রেডিও টিউন করে নানা ভাষায় কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে। সহসা আমাদের চেনা ভাষায় শুনতে পেলাম: 'বুঝতে পারছো, বুঝতে পারছো?'

সুশোভনবাবু শান্তগলায় বললেন: 'হ্যাঁ, কে তোমরা? কী চাও? তোমরা কি পৃথিবীর আকর্ষণের গন্ডিতে পড়ে এখানে এসেছো?'

'না। আমরা এখান থেকে কথা বলছি না। সৌরজগতের অন্যপ্রান্তে কোটি কোটি মাইল দূর থেকে আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি।'

হঠাৎ সুশোভনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমাদের ধরে রেখেছ কেন? কী চাও এখানে?'

'আস্তে, অত জোরে কথা বলবার দরকার নেই রেডিও মাইক্রোফোনের সামনে। আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তোমাদের ফিসফিস কথা। আমরা কে জানতে চাও? হা!হা! ক্লাইড টমবাও-এর কথা মনে পড়ে?'

'ক্লাইড টমবাও? অ্যারিজোনার টমবাও?'

'হ্যাঁ, সেই যে লোকটি তোমাদের গ্রহলোকে একটা ক্ষুদ্র আলোকণার ছবি দেখিয়ে আলোড়ন তুলেছিল। আমরা তাকে দেখাতে চাই আমাদের গ্রহ সত্যি সত্যি কত উজজল!'

'কিন্তু সে তো আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা! এখন ক্লাইড বোধহয় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ! তাকে তোমরা পাবে কোথায়?'

সুশোভনবাবুর কথায় সহসা কোথায় যেন আলোড়ণ জাগলো। সেই আলোক স্তমভ থরথর কেঁপে উঠলো। আমরা ঊর্ধশ্বাসে ছুটলাম উল্টোপথে দরজার সন্ধানে। কিন্তু দরজা কোথায়! নিরেট দেওয়ালের ওপারে কোথায় যেন রকেটের গর্জন শোনা যাচ্ছে-।

আমি চিৎকার করে উঠলাম: 'একী, আমরা কোথায় চলেছি?'

'ক্লাইড টমবাও-এর পাপের শাস্তি একই গ্রহবাসী হিসাবে তোমাদেরই পেতে হবে। প্লুটোয়ানদের দরবারে তোমাদের ক্ষমা নেই। লক্ষ কোটি মাইল জুড়ে তোমরা উড়ে চলবে প্লুটোর দিকে। তোমরা কখন এসে পৌঁছবে জানি না, আর তখন তোমাদের অধ্যাপক কী দেখাবেন? তিনি তো তখন

চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ। তাঁর বইতে পড়া কল্পনায় ত প্লুটো একটি শীতল, মৃত গ্রহ। নি:সঙ্গ। তাঁর জন্য আমরা সেই বন্দোবস্তই করবো। আর তোমরা বাকিরা যখন পৌঁছবে তোমাদের থাকবে পূর্ণ যৌবন। তোমরা তাই দেখতে পাবে, আলো, সবুজ ঝলমলে উৎসবমুখর প্লুটো।'

অকস্মাৎ সুশোভন বাবু তাঁর রুকস্যাক থেকে একটা বড়ো সিরিঞ্জ বের করলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'তোমাদের আর তিন মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে তোমরা যদি আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে না নিয়ে যাও তবে তোমাদের রেডিও কন্ট্রোল নষ্ট করে দেওয়ার মত বিসফোরক আমার কাছে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য কন্ট্রোল নষ্ট হলে আমরা পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতেই ফিরে যাবো।'

বেশ বুঝতে পারছিলাম আমরা উঠছি ওপরের দিকে। অজানা ভয়ে আমি যেন অজ্ঞান হয়ে পড়বো। খানিক বাদে সুশোভন বাবু সেই স্তমভটা লক্ষ্য করে ফায়ার করলেন। চকিতে সিরিঞ্জ থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে স্তমভটাকে গলিয়ে একটা গহ্বরের সৃষ্টি হলো। সহসা আলোটা যেন নিভে গেল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে শুনলাম সুশোভনবাবুর বজ্র কঠিন নির্দেশ: 'ফলো মি!'

গর্তের ভেতর দিয়ে যানটির বায়ুশূন্য ফাঁপা অংশ দিয়ে সশব্দে আমরা এসে পড়লাম কাঁটা ঝোপের উপর। আমাদের ব্যথা বেদনা বোধের শক্তি লোপ পেয়েছে। যন্ত্রচালিতের মত উপরে তাকিয়ে দেখি অতি ধীরে মহাকাশ যানটি উপরে উঠে যাচ্ছে। সুশোভনবাবু আরেকবার উপরদিকে হাত তুলে সিরিঞ্জটা নি:শেষ করে দিলেন।

যানটির তলাকার অংশ ফসফরাসের মত জলতে লাগলো। হঠাৎ তীব্র বেগে মেঘের কাছে উঠে গিয়ে ফেটে পড়লো- বুম্ বুম্ বুম্-----'

এক ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠলো মেঘলোক জুড়ে, আর টুকরো টুকরো হয়ে মহাকাশ যানটি ভেঙে পড়লো ফুলঝুরির কণার মত।

সম্বিত ফিরতে দেখি মাষ্টারমশায় মাথাটা ঝুঁকিয়ে রয়েছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন: 'ওরা আবার আসবে, ওরা আবার আসবে অমরেশ!'

ওঁর অর্ধ সংজ্ঞাহীন দেহ আমরা অতি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে তাঁবুর দিকে চলেছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি মেঘের মাথায় তখনও লাল আভা।

শারদীয় তরুণতীর্থ, ১৩৭১-এ প্রথম প্রকাশ।
গল্পের শিরোনামের ডিজাইন প্রথম
প্রকাশনের অনুরূপ রাখা হয়েছে।
ছবি : মৌসুমি

সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

কিন্তু হেমবাবু জখম হয়েছেন বটে, খতম হন নি। ওনার প্রকৃতিস্থ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। এসে বসেছেন বারান্দার আরাম কেদারায়। এক কালে এর চাইতেও বড় সংকট, উৎ কট বিপদ পার হওয়া গিয়েছে। ফিরে এসেছে অভিজ্ঞতার হাতে পেটানো শক্ত ব্যক্তিত্ব। লন্ঠনের আলো-আঁধারে ওনার মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে, যেন মেঘের পাহাড় জমেছে। কলকাতার অতিথিরা এতসব অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি।

ওনার সাবেক মেজাজটা এবার সবাক হয়ে উঠল। ডাকো লেঠেল আর সেপাই সর্দারদের। অনেকদিনের অব্যবহারে যাদের আজ মরচে পড়েছে শরীরে। বর্তমানের মলাটের তলায় লুকিয়ে ছিল জমিদারি বাঘ নখ। ওরা এসে দাঁড়িয়েছে দালানে। হেমবাবু অতীতের গায়ে হাতড়াচ্ছেন-- সংসার-সীমান্তে কতটুকু শক্তি বজায় আছে? বর্শা আর লাঠি। ঘরের লক্ষ্মী। এরা এ বাড়ির নিমক খেয়েছে বংশানুক্রমে। লড়েছে, আর গড়েছে সংসারটাকে। আত্মজীবনীর সশস্ত্র চেহারাটা এবার ডায়েরির পাতা থেকে উঠে এসেছে। সেপাই সর্দার সামনে এসে দাঁড়াল। বিনীত প্রণাম।

ঠাকুর্দা বললেন, ''হায়দার চলে গেল। গৃহলক্ষ্মী তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। ও স্বভাব চঞ্চল। ওর মাথায় গজমতি আছে। মুখে গজদন্ত। অনেকেরই লোভ আছে ওর ওপর। মত্ত হাতি মানুষ মারতে পারে। আমার এক দায়িত্ব আছে আশেপাশের গ্রামের ওপর। সে আর ফিরবে কিনা জানিনা। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, সেই শক্তি আমার নেই। ওকে খুঁজে বেড়াও। যেখানে থাক, যতদূরেই থাক। ফেরাতে না পারো, চোখের আড়াল করা চলবে না। লেঠেল সর্দারকে ডাকো।''

লাঠিয়াল এগিয়ে এসে লাঠি মাটিতে শুইয়ে রেখে প্রণাম করল। ''ভেবেছিলাম তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোরা আমার দুর্দিনের দামাল বন্ধু। আমার ওই অবোধ ছেলেকে ফিরিয়ে আন। যে আমার হায়দারের খবর প্রথম দেবে তাকে দু বিঘে জমি দেবো।'' এই দেওয়ার অর্থ দেনাপাওনার অভিধানে পাওয়া যাবে না। ওরা জানে কত মরমী এই দান। উনি সকলের দিকে তাকিয়ে শেষবার অদ্ভূত চড়া গলায় বললেন, ''যাও।'' আমার কানে সেটা শোনালো যেন মার্শাল কল--''শুট্।'' জমিদারির

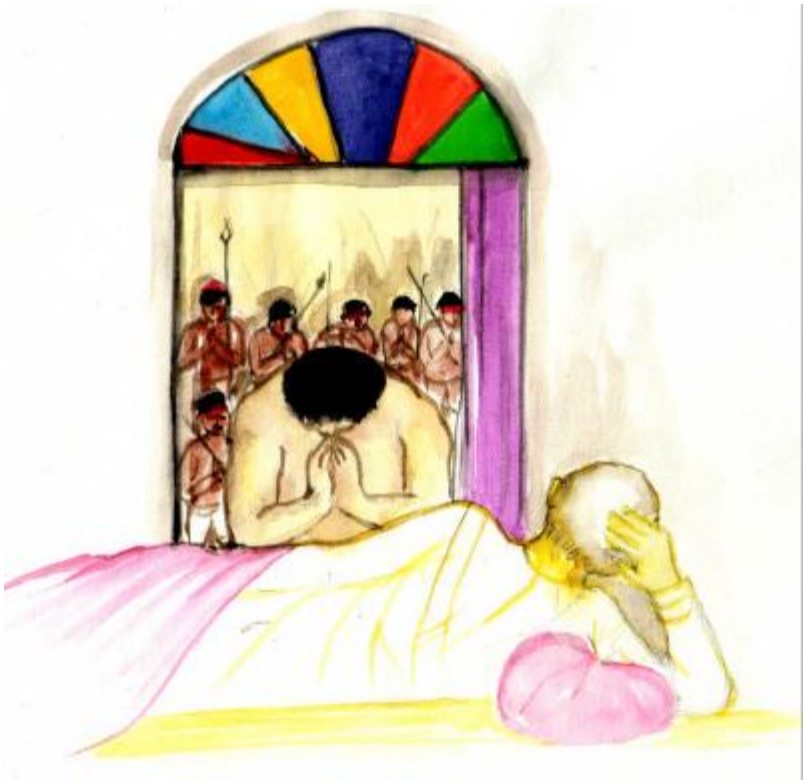

দামাল রথ কৃষ্ণপক্ষের রাতে মশাল জালিয়ে, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, গ্রামের গলিতে, চষা মাঠে, উধাও দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়ে জাল পাতল। ঠাকুরদার আত্মজীবনীর ডিকটেশান এবার বন্ধ। ওনার শোয়ার ঘরের মেঝেতে বসে রাঙাপিসি লন্ঠনের আলোতে কী লিখছেন? টুকসি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, '' পিসি তুমি কী লিখছ?''

''আজকের দিনটা। এই যা দেখলে, শুনলে, সব লিখে রাখছি। তোমার নামটাও টুকে রাখলাম খাতায়। টিঁকে থাকবে অনেকদিন। সেই ডায়েরি। রাঙাপিসি খাতা ও সুন্দর এক কলম তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ''বাবা তোমার জীবনী লেখ।'' ছোট মেয়ের অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। শক্ত মানুষ ছিলেন, তাই নরম জমিতে লড়াই করতে পারতেন না। বাড়ির মেয়েদের কাছে আত্মসমর্পণ। নিজের মেয়েদের দিকে একটু বেশি টান। ছেলেদের , বউদের সম্মান ও মর্যাদার ওপরে কড়া নজর। কেবল নাতিরা ছিল বুড়োর ব্লাইন্ড স্পট। ঠাকুরদা রাতকানা আর নাতিকানা। আজ সন্ধ্যায় আবার সংসারের হাল ধরেছেন। উৎ সবের বাড়ি আবার হাঁকডাক করে উঠল। ঠাকুরদার চোখে কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না। ''নাতিগুলো কেন প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরে না? আমরা বাপের জন্মে কেউ ধুতি ছাড়িনি।''

বাবা আমার হাত ধরে দোতলায় নিয়ে গেলেন।

''নাও, ধুতি পরো।''

''না। আমার লজজা করে। ওটা খুলে যায়।''

''তবে কি তুমি হাফ প্যান্ট পরে হাফ নেকেড ফকির হয়ে বিয়েবাড়িতে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াবে?''

আমি হাত ছাড়িয়ে সটান দৌড় দিলাম। বাল্যের স্বাধীনতা বাহুবলে নয়, দৌড়েই রক্ষা করা যায়। ছিটকে গেলাম দক্ষিণের বারান্দায়। বাবা ইংরেজ গোরা সৈন্যের মতো ধাওয়া করলেন। ঘরে দেওয়ালে ঝোলানো ছিল ঘোড়ার চাবুক। হাতে তুলে নিয়ে হাওয়ায় সপাং সপাং চালাচ্ছেন। আজ যেন হায়দারের বিরহে গায়ের জালা আমার পিঠে জুড়োতে চান। আমি ছুটে গেলাম উত্তর , দক্ষিণ ও পূর্ব বারান্দা দিয়ে। এমন সময় মেজ জেঠিমা মাঝখানে এসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তাল কেটে দিলেন। আমাকে

আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন, ''ঠাকুরপো, তুমি কোনদিন কারো গায়ে হাত তোলো নি। তুমি অজাতশত্রু। কিন্তু আজ তুমি কেন স্বধর্মে বিধর্মী হবে?''

বাবা এবার সত্যিই লজজিত। ইতিমধ্যে আমার ছায়াসঙ্গিনী গুটি গুটি সেখানে পৌঁছে গেছে। জিজ্ঞাসা করল, ''তোমার ভয় করছে?'' আমার বোবা ধরা স্বরে উত্তর এলো, ''বু-উ-উ''। ঘরের মধ্যে এক বিশাল বল্লম দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। জমিদারির এই নরমে গরমে সংসারের মেজাজ চোরাবালির মত ভয়ংকর ঠেকছে তার।

ছবি: মৌসুমি

স্মরণীয় যাঁরা

জর্জ সুদর্শন

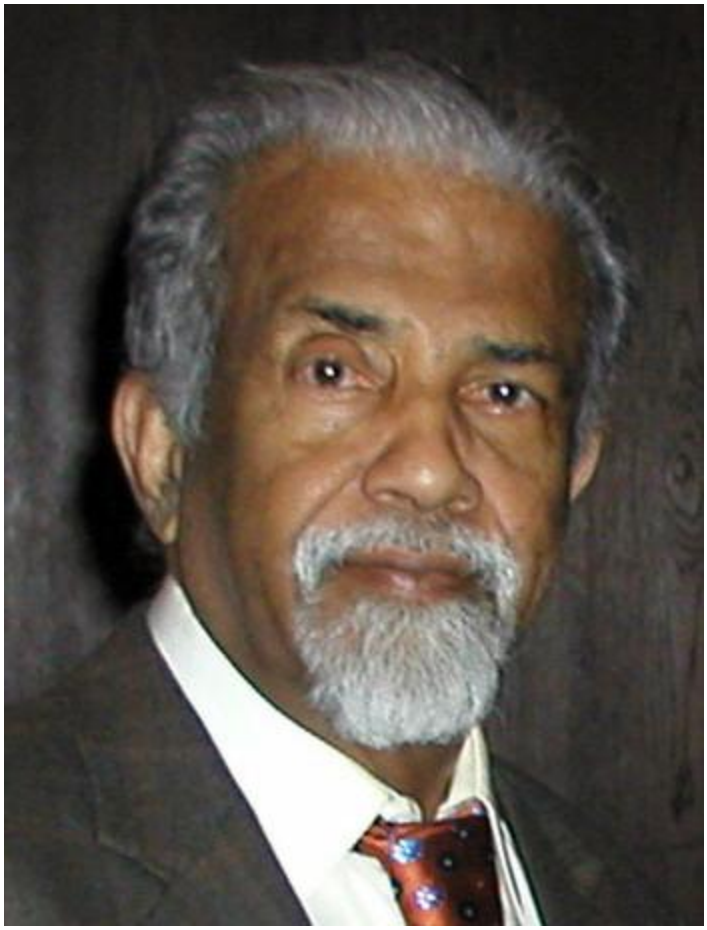

পুরো নাম এনাক্কাল চণ্ডী জর্জ সুদর্শন। কেরালার কোট্টায়াম জেলার পাল্লাম-এ জন্ম, ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। ১৯৫১ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক হন মাদ্রাজ খ্রিষ্টান কলেজ থেকে। ১৯৫২তে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

পাশ করবার পর তরুণ সুদর্শন বিজ্ঞানি হিসেবে মুম্বইয়ের টাটা ইন্সটিট্যুট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে গিয়ে ড: হোমি ভাবার অধীনে কাজ শুরু করলেন। অল্প কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর সুদর্শন গিয়ে উঠলেন নিউ ইয়র্কের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৮ সালে সেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করবার জন্য চলে গেলেন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে, জুলিয়ান শুইঙ্গার-এর কাছে।

এই অবধি পড়ে তোমরা বলবে, বা: বেশ। ইনি একজন সফল ভারতীয়। কিন্তু ওরকম কতোই তো আছে। হঠাৎ ওঁর গল্প কেন? কারণটা বলি শোন। মানুষের বিজ্ঞানকে বিরাট বড়ো বড়ো কয়েকটা পদক্ষেপ এগিয়ে দিয়েছেন এই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মানুষটি। এমন কিছু বৈপ্লবিক আবিষ্কার ইনি করেছেন বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে যাদের তুলনা কমই মেলে। এইবারে তার কয়েকটা উদাহরণ দিই।

মহাবিশ্বের সবকিছু তৈরি হয় চারটে মূল শক্তি বা ফোর্স থেকে। তাদের নাম তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি (যেমন আলো, এক্স রে, ইত্যাদি), অভিকর্ষ, স্ট্রং ফোর্স (পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রটাকে স্থায়ীত্ব দেয় যে শক্তি) আর উইক ফোর্স (তেজস্ক্রিয়তার শক্তি) দুনিয়ার আর যতকিছু বস্তু বলো কি শক্তিই বলো, তার সবই এই চার শক্তির খেলা। বিজ্ঞানীরা দাবী করেন আসলে এই চার শক্তি আদিতে একখানাই শক্তি ছিল। বিশ্ব যখন সৃষ্টি হল তখন তার অস্তিত্ব ছিল সেই একটাই প্রথম আদিশক্তির চেহারায়। তারপর তা যতই প্রসারিত হতে শুরু করল ততই তার তাপমাত্রা গেল কমে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি সেই আদি শক্তি ভেঙে চারটে আলাদা আলাদা শক্তির রূপ নিয়ে নিল। কেমন ছিল সেই আদি শক্তির রূপ? বুঝতেই পারছ যদি সেই আদি শক্তির রহস্যকে ভেদ করা যায় তাহলে ব্রহ্মান্ডের

প্রকৃত রূপটার ঠিকানা পেয়ে যাবে মানুষ। এ যেন প্রায় ভগবানের দেখা পাবার মতন ব্যাপার। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় গ্র্যাণ্ড ইউনিফায়েড থিওরি বা গাট থিওরি।

এই শক্তির একিভবনের পথে বেশ খানিকদূর এগিয়েছি আমরা। তৈরি হয়েছে ইলেক্ট্রোউইক তত্ত্ব, যাতে শক্তির এমন একটা মডেল তৈরি হয়েছে যাতে প্রমাণ করা গেছে যে কম তাপমাত্রায় তড়িচ্চুম্বকিয় শক্তি ও উইক ফোর্স দুটো আলাদা আলাদা শক্তি হিসেবে চেনা গেলেও ১০০ গিগা ইলেক্ট্রনভোল্ট শক্তিস্তরে (মানে যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অতি সামান্য সময় পরে তার তাপমাত্রা যেমন ছিল সেই অবস্থায়)তড়িচ্চুম্বকিয় শক্তি ও উইক ফোর্স মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়, তৈরি হয় ইলেক্ট্রোউইক ফোর্স। আদিশক্তির সন্ধানে মানুষের যাত্রাপথে এ এক অতি গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কার। এই একিভবনের গবেষণা করে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরষ্কার পান আবদুস সালাম, স্টিভেন ওয়েইনবার্গ ও শেলডন গ্লাসো।

এই আবিষ্কারটা ঘটানো গেছে আর একটা মৌলিক আবিষ্কারের দৌলতে। তার নাম ভি এ প্রতিক্রিয়া। সহজ ভাষায় বললে, ভি এ প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বের মাধ্যমেই প্রথম উইক ফোর্সের সমপূর্ণ চরিত্রটাকে উদঘাটন করা হয়। আর একবার তার প্রকৃত চরিত্রকে চিনতে পারবার ফলে তার ওপরে ভর করেই আরও একধাপ এগিয়ে প্রমান করা গেছে যে উইক ফোর্সের সঙ্গে তড়িচ্চুম্বকিয় শক্তি আসলে একই শক্তির দুটো রূপ।

রচেস্টারে পি এইচ ডি করতে করতেই ১৯৫৬ সালে পঁচিশ বছরের যুবক সুদর্শন জন্ম দিয়েছিলেন এই ভি এ

তত্ত্বের। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ১৯৫৭ সালে রচেস্টারের হাই এনার্জি কনফারেন্সে তাঁকে তাঁর গবেষণাপত্র পড়তে দেয়া হয়নি। কারণ, ওটা নাকি বড়োদের কনফারেন্স। গ্র্যাজুয়েট স্তরের ছাত্রদের ওতে পেপার পড়তে দেয়ার নিয়ম নেই।

১৯৬৩ সালে আরও একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন সুদর্শন। আলো কী দিয়ে তৈরি? কিছু ধরনের পরীক্ষায় দেখা গেছে তা তৈরি হয় কিছু সুক্ষ্ম আলোককনিকা দিয়ে যাদের নাম ফোটন। এসব পরীক্ষায় প্রমাণ হয় আলো হল রাশি রাশি ফোটন কণার ধারা। আবার অন্য কিছু পরীক্ষা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে আলো একটা তরঙ্গ। ঢেউয়ের মতই তার এগিয়ে চলার ঢং। প্রকৃতির এই গুপ্ত রহস্যের চাবিকাঠিটি খুঁজে বের করলেন সুদর্শন। তাঁর তত্ত্ব (তাত্ত্বিক নাম সুদর্শন রিপ্রেজেন্টেশান) প্রমাণ করল, আসলে কণা ও তরঙ্গধর্মীতা কোন দ্বৈতচরিত্র নয়। আসলে একটিই গভীরতর চরিত্রের দুটো আলাদা বহি:প্রকাশমাত্র। মজার কথা হল, এ আবিষ্কারটার ওপর আরও একটু কাজ করে ২০০৫ সালে গ্লবার নামে এক বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরষ্কার পেয়ে গেলেন। সুদর্শন কিন্তু বঞ্চিতই থেকে গেলেন।

সুদর্শনের বহু কাজকর্মের মধ্যে আরও একটা আকর্ষণীয় কাজের উদাহরণ দিয়ে লেখা শেষ করবো। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে, আলোর চেয়ে জোরে কোনকিছু চলতে পারেনা। সুদর্শন অংক কষে প্রমাণ করেছেন যে সেটা ঠিক নয়। তত্ত্বগতভাবে আলোর চেয়েও জোরে ছোটে এমন একটা কণা থাকা সমভব। তার নাম দেয়া হয়েছে ট্যাকিওন।

দেশে বিদেশে অজস্র পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন সুদর্শন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুটি হচ্ছে ভারত সরকারের দেয়া পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভুষণ। ২০১০ সালেও তিনি পেয়েছেন ডিরাক মেডাল নামের সম্মানজনক এক পুরষ্কার।

নোবেল পুরষ্কার না পাওয়া নিয়ে কিছুকাল আগে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে ভারী সরল ভঙ্গীতে নিজের প্রতিবাদটা জানিয়েছেন সুদর্শন। তাঁর কথায়, '' স্টিভেন ওয়েইনবার্গ, শেলডন গ্লাসো আর আবদুস সালাম যে কাজটার জন্য নোবেল পেলো সেটার ভিত্তি ছিল আমার গবেষণা। একটা বাড়ি তৈরির জন্য যদি কোন পুরষ্কার দেয়া হয় তাহলে তার ভিৎ আর একতলাটা যে গড়ল তাকে ভুলে গিয়ে শুধু দোতলার কারিগরকেই পুরষ্কৃত করা হলো এ কেমন বিচার?''

সাহেবরা অবশ্য আমাদের নিয়ে চিরটাকাল এমনটা করেই এসেছে। বেতার আবিষ্কার করলেন জগদীশ চন্দ্র বসু, আর নোবেল পেলেন মার্কনি। আধুনিক পদার্থবিদ্যার এক প্রধান স্তমভ 'বোসন' কণার আবিষ্কারক সত্যেন বসু, নোবেল দূরস্থান, কোন বড়োসড়ো স্বীকৃতিই পেলেন না। তিনি বেঁচে রয়েছেন কেবল তাঁর আবিষ্কৃত বোসন কণার নামটার মধ্যে দিয়ে। কাজেই এই অবহেলা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়।

সুদর্শন কিন্তু তাই বলে থেমে নেই। প্রকৃতিকে গভীরভাবে জানবার কৌতুহলই সমভবত তাঁর চলার শক্তি জোগায়। সত্যিকারের কাজে লোক যাঁরা তাঁরা আর কবে পুরস্কারের লোভে কাজ করেছেন বলো? কাজ করবার আনন্দেই তো তাঁরা কাজ করে যান। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও চলেছে এই সত্যসন্ধানীর গবেষণা। ভারত ও মানবজাতিকে তিনি গর্বিত করেছেন। ভবিষ্যতেও তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে আবারও গর্বিত করবেন আমাদের, এই আমাদের আশা।

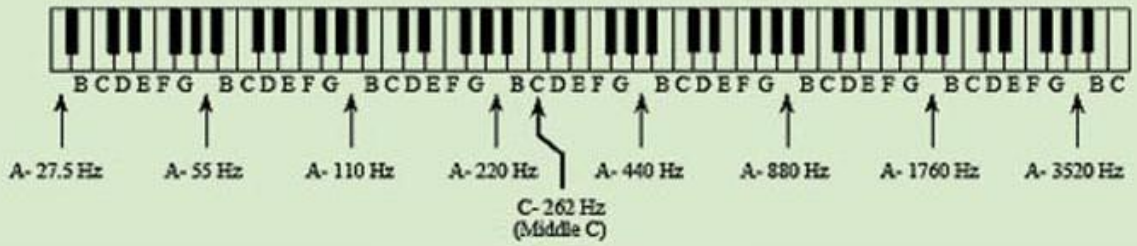

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

কেমন করে ছন্দের দোলায় দোলায় বিপুল শক্তি জড়ো হয়ে মাইলখানেক লম্বা ট্যাকোমা ন্যারো ব্রিজটা ভেঙে পড়েছিল তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল আগের বার। সেই ছন্দেরই দোলায় সৃষ্টি আর বিনষ্টির যে খেলা প্রতিটি মুহূর্তে ঘটে চলেছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড জুড়ে, এমন কি আমাদের নিজেদের শরীরেও, তা নিয়ে আমরা একটুও মাথা না ঘামালেও সেই শক্তি-নৃত্যের কিন্তু এক মুহূর্তও বিরাম নেই। নৃত্য কথাটা ইচ্ছে করেই বলছি - নাচ্ বলছি না বলি-টলিউডি মহাপ্রভুদের নাচ্ থেকে আপাততঃ দূরে থাকতে।

মানুষের শরীরে রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের যাওয়া-আসা রেডিও-আইসোটোপ দিয়ে পরীক্ষা করে ডক্টর পল সি অ্যাবার্সল্ড দেখেছেন মানুষের শরীরে যত পরমাণু(গড়ে ৭^{১০২৭} গুলো) আছে তার প্রায় ৯৮ ভাগই বছরে অন্ততঃ একবার পুরোপুরি পাল্টে যায়। ঘটনাটা সমস্ত জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রেই ঘটে। ছবির মত করে ভাবলে জৈব শরীর যেন এমন একটা ব্যূহ যার গঠনটা একই থাকলেও সৈন্যসামন্ত সব একটা সময়ের পর পুরোপুরিই বদলে যায়। তাহলে 'আমি' বলে যে শরীরটাকে ভাবি, সেটার গড়নটা চেনা হলেও সব সময়ই তার পরমাণুগুলো পাল্টে চলেছে 'আমি'-টার বাইরের জগত থেকে অনু-পরমাণু গুলো গ্রহন করে। আর তাই গত বছরের আমি আর আজকের আমি দেখতে এক হলেও আসলে একেবারেই নূতন। কোন জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংসই তাই আসলে সেই অর্থে কোন কিছুর শুরু বা শেষ নয়।

মজার কথা হল, এমনকি তথাকথিত জড় পদার্থগুলোর বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে - যদিও সে ক্ষেত্রে সময়টা লাগে তুলনায় বেশ বেশী। ফ্রিৎজফ্ কাপরার কথায় সৃষ্টি আর বিনষ্টির এই ছন্দ শুধু যে ঋতু পরিবর্তন বা জীবের জন্ম-মৃত্যু দিয়েই বোঝা যায় তাই নয়, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান (ফিজিক্স) দেখাতে পেরেছে অজৈব জড় পদার্থও এই একই ছন্দে তৈরি হয়, পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞান এখন দেখাতে পারছে যে প্রতিটি অব-পারমাণবিক কণা বা কণা-প্রতিমরা (ভার্চুয়াল পার্টিকল্স - প্রচলিত অর্থে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কণা নয় যারা) শুধু শক্তি-নৃত্যে বিভোর তাই নয়, ওরা নিজেরাই সেই শক্তি-নৃত্য, যেন নৃত্যরত সৃষ্টি ও ধ্বংস - জন্ম-মৃত্যু ! এই নৃত্যের বিভিন্ন ছন্দই কণাপ্রতমগুলির বৈশিষ্ট ও স্বভাবের আসল চাবিকাঠি। বিভিন্ন কণাপ্রতিমের নৃত্যের ছন্দের বিভিন্নতার জন্য প্রয়োজন পড়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ শক্তি আর তাই তাদের ভরও হয় আলাদা আলাদা। এই কণা-প্রতিম গুলোই যে আসলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কণাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ শুধু তাই নয়, এরা শুন্যতা (void) থেকেই উৎপন্ন হয় আবার শূন্যতাতেই বিলীন হয়। তাই, শুধু জড় পদার্থ নয়, শুন্যতাও এই মহাজাগতিক শক্তি-নৃত্যের শিল্পী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড় পদার্থের গভীরতম অংশের সুক্ষ্মতম কণাপ্রতিমদের চলন নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করার পর এখন বুঝতে পারছে যে আসলে শক্তি(এনার্জি)'র বিভিন্ন ভাবে সেজে ওঠা গঠনই পদার্থের বাইরের চেহারাটা তৈরী করে - কণা বলে আলাদা কোন কিছুই সেই অর্থে নেই - সবটাই আসলে শক্তির বিভিন্ন ধরণের ছন্দের নৃত্য।

এবার মনে হচ্ছে না কি যে সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতার কল্পনা - নৃত্যের রাজা নটরাজের নৃত্যরত রূপ - শুধুই ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজো করার জন্য নয়, বরং আসলে জড় বা জীবের ভেতর আসলে কোন্ খেলা চলছে প্রতি মুহূর্তে সেই কথাগুলোই মনে করিয়ে দেবার জন্য? ভেবে অবাক লাগে না যে মননের এই উচ্চতম স্তর, আধুনিকতম থেকেও আধুনিক অনুভব সেই কোন প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার? হয়তো এমনকি মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার চেয়েও প্রাচীনকালের অনুভবের সেই গভীরতা থেকে আমরা আজ কয়েক আলোকবর্ষ দূরে চলে এসেছি শুধু তাই নয়, নিজেদের আধুনিক আর বিজ্ঞানমনস্ক প্রমান করতে সে সব কিছুকে অবজ্ঞা করতেও শিখেছি। কিন্তু মজাটা এই, যে যাদের কাছে আমরা নিজেদের আধুনিক প্রমান করতে চেয়েছি পুরোনো সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে, পাশ্চাত্যের সেই আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছেই অব-পারমাণবিক (সাব-অ্যাটমিক) কণার নৃত্য আজ নটরাজেরই নৃত্য - আর তাই নটরাজের এই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিটির ছায়া কি অদ্ভুত প্রাসঙ্গিকভাবে খেলা করছে সার্ন-এর প্রধান কার্য্যালয়ের দেওয়ালে!

সার্ন-এর প্রধান কার্য্যালয়ের দেওয়ালে নটরাজের ছায়া!
(Courtesy - http://www. thepeoplesvoice.org/
TPV3/Voices.php/2010/11/14/the-large-hadron-collider-and-the-statue-5)

সার্ন - CERN-Conseil Europe`en pour la Recherche Nucle`aire- বা European Organization for Nuclear Research) - যাদের অন্যতম মূল কাজ ফ্রান্স-সুইডেন সীমান্তে যে 'লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার'-এ মিনি বিগ ব্যাং তৈরীর চেষ্টা চলছে, তার তত্বাবধান করা।

ফ্রিৎজফ্ কাপরা - ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পি.এইচ্.ডি করার পর প্যারিস,

ক্যালিফোর্ণিয়া ও লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে, স্ট্যানফোর্ড লিনিয়র অ্যাক্সিলেটর সেন্টারে পার্টিকল্ ফিজিক্স-এ গবেষণা করেন। পড়িয়েছেন সান্টা ক্রুজ, ইউ.সি.বার্কলে ও সানফ্র্যানসিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি তে। কাপরা-ই বি.বি.সি'র ডকুমেন্টারি সিরিজ বিউটিফুল মাইন্ডস এর প্রথম বিষয়বস্তু আর তাঁর লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত বই - দ্য তাও অফ্ ফিজিক্স।

খেলার পাতা

পর্বতারোহণের প্রাথমিক পাঠ শেষ হল। এই সংখ্যায় শৈলারোহণ সমপর্কিত কিছু পরিভাষা দিলাম:

অ্যারেইট্ (Arete) - খাড়াই শৈলশিরা।

এ্যাবসেল বা র‍্যাপেল (Abseil or Rappel) উঁচু শৈলপ্রাচীর অথবা বরফের দেওয়াল থেকে একজোড়া দড়ির সাহায্যে পাথর অথবা গাছে অ্যাংকর করে দ্রুত অবতরণ।

অ্যাংকর (Anchor)- পর্বতগাত্রের পাথরের খোঁচ অথবা স্পাইক অথবা শিলাগাত্র থেকে বেরিয়ে আসা কোনো পাথুরে অংশ অথবা গাছের ডাল যার সঙ্গে দড়ি অথবা স্লিং দিয়ে বেঁধে শৈলারোহী নির্বিঘ্নে আরোহণ, অবরোহণ কিংবা অবস্হান করতে পারে।

আর্টিফিশিয়াল্ ক্লাইম্ব (Artificial Climb)- কঠিন শৈলপ্রাচীরে পিটন কিংবা বোল্ট অথবা স্টিরাপের সাহায্যে আরোহণ।

ব্যাকিং আপ (Backing-Up)- চিমনির একদিকের দেওয়ালে পা রেখে এবং বিপরীত দেওয়ালে পিঠের চাপ দিয়ে ওঠা।

বিলে (Belay)- পতন থেকে রক্ষার জন্য কঠিন শৈলপ্রাচীরে আরোহীদের পরস্পরের মধ্যে বাঁধা দড়ি। বিলের দড়ি আরোহীকে কঠিন শৈল প্রাচীরে অবস্হানের নিশ্চয়তা দেয় এবং সহ-আরোহীকে আরোহণে সাহায্য করে।

ব্রিজিং বা স্ট্র্যাড্‌লিং (Bridging or Straddling) - পাহাড়ের চিমনি অথবা গ্রুভ অথবা কর্ণারের বিস্তৃত দেওয়ালের দু'পাশে পা রেখে ফাটলের দিকে মুখ করে অরোহণ। এ প্রক্রিয়ায় চওড়া ফাটল চমৎকার আরোহণ করা যায়।

বার্নিং গ্লাভস্ (Burning Gloves) আরোহন কিংবা অবরোহণের সময় সহ-আরোহীকে বিলে করার সময় চামড়ার অথবা পশমের দস্তানায় দড়ির ঘর্ষণজনিত উত্তাপ। এই ঘর্ষণে হাতে ফোসকা পড়তে পারে।

বাট্রেস (Buttress) প্রসারিত বিশাল গিরিশরা যা অবশিষ্ট গিরিশরা থেকে গালি অর্থাৎ নালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সমপূর্ণ আলাদা একটি প্রাচীরের মতো দেখায়।

কেয়্যার্ন (Cairn)- শিলাস্তূপ। পর্বতশীর্ষে অথবা গিরিবর্ত্মের ওপর অথবা চলার পথের নিশানা হিসাবে কেয়্যার্ন স্হাপন করা হয় শিলায় ওপর শিলা স্হাপন করে।

সিলিং (Ceiling) ওভারহ্যাং রক্-এর নিচে পাথরের ছাদ। একে রুফ্ ও বলে।

চিমনি (Chimney) - শৈলগাত্রের লম্বালম্বি ফাটল, যেখানে আরোহীর দেহ স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে।

চোক্‌স্টোন (Chockstone) -চিমনি অথবা গালি অথবা ফাটলের মধ্যে আটকে থাকা প্রস্তরখন্ড।

চোস্ (Chose) -অপরিচ্ছন্ন, আলগা, ভাঙাচোরা অথবা শ্যাওলাধরা প্রস্তরখণ্ড।

কল (Col) -সুউচ্চ পর্বতের উপরিস্হিত গিরিবর্ত্ম।

কুম (Coomb) - সুউচ্চ ঝোলানো উপত্যকা যেখানে সাধারণত গিরিপ্রাচীর অবস্হিত।

কর্ণিশ (Cornice) -সুউচ্চ তুষারাবৃত গিরিশিরা অথবা পর্বত শিখরের ওপর বায়ুতাড়ির বরফের ঝুলন্ত ছাদবিশেষ। কর্ণিশের ওপর দিয়ে চলা খুবই বিপজজনক। দেহের ভারে ঝুলন্ত বরফ ভেঙে পড়তে পারে।

ক্র্যাক (Crack) -ফাটল। শৈলপ্রাচীরের লম্বালম্বি ফাটলে আরোহীর দেহ প্রবেশ করে না বটে, তবে ফাটলের মধ্যে হাত, পা অথবা আঙুল প্রবেশ করিয়ে আরোহণ করা যায়। আড়াআড়ি ফাটল ধরেও ভাল আরোহণ করা যায়।

ক্রাক্স (Crux) -শৈলপ্রাচীরের কঠিনতম আরোহণের অংশ বিশেষ।

ডেড্ হ্যাণ্ড (Dead Hand) -যে হাতে কয়েল করা দড়ি ছাড়া হয়। আরোহণ অথবা অবরোহণের সময় আরোহীর বিলে দড়ি কোমর অথবা কাঁধের ওপর রেখে বিলেকারী যে হাতে দড়িটিকে ধীরে ধীরে ছাড়ে সেটিই ডেড্ হ্যাণ্ড। এই হাতে আরোহীর পতন রোধ করা যায়।

ডাইরেক্টিং হ্যান্ড (Directing Hand) - যে হাতে আরোহীর কোমর থেকে আসা বিলে দড়ি বিলেকারীর হাতে থাকে।

ইট্রিয়ার (Etrier) -দীর্ঘ ওভারহ্যাং রকে কৃত্রিম উপায়ে আরোহণের জন্য দড়ির তৈরি ছোট মই। দু'গাছা দড়িতে এ্যালুমিনিয়াম অথবা কাঠের সরু সিঁড়ি লাগানো থাকে।

ফ্রিকশন ব্রেক (Friction Breke) - আরোহণ- অবরোহণের সময় দড়ি ছাড়া অথবা টেনে নেওয়ার সময় যদি আরোহীর পতন হয়, তাহলে পতনজনিত দড়ির প্রচণ্ড আকর্ষণ বিলেকারীর কোমরের ওপর দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পতন রোধ করে।

গ্যাংওয়ে (Gangway) -শৈলপ্রাচীরের গায়ে আড়াআড়ি অথবা কোণাকুণি ভাবে অবস্হিত সূক্ষ্ম পাথরের শিরা। এই শিরার ওপর দিয়ে ভাল আরোহণ করা যায়।

গার্ডেনিং (Gardening) -শৈলপ্রাচীরে অথবা ফাটলে অথবা চিমনীতে আরোহণের পূর্বে ধুলোমাটি, শ্যাওলা বা গাছগাছালি সাফ করা।

গার্ডেল (Girdle)- সুদীর্ঘ খাড়াই পর্বতগাত্রে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করা।

গ্রুভ (Groove)- পাথরের স্লাবে 'দ' আকারের হেলানো ফাটল।

গালি (ally)- বিশাল নালা। বাট্রেসের উভয় দিকে এই নালা দেখা যায়। গালি গিরিশরা থেকে পাহাড়ের এক বিশাল অংশকে বিভক্ত করে বাট্রেসরূপে।

হ্যাণ্ড জ্যাম (Hand Jam) - ফাটলের মধ্যে হাত রেখে জ্যাম করে আরোহণ।

হ্যান্ড ট্র্যাভার্স (Hand Traverse) -যে শৈলপ্রাচীরে পা রাখার মতো হোল্ডস্ নেই এবং আরোহীকে হাতের সাহায্যে ঝুলে কঠিন পথ পার হতে হয়।

আইস এক্স (Ice Axe) -সাধারণত ২ থেকে ৩ ফুট লম্বা। কাঠের হাতলের মাথায় পিক্ এবং ব্লেড আছে যার দ্বারা বরফে পা রাখার ধাপ ও গর্ত করা হয় এবং বরফের টুকরো ব্লেড দিয়ে সাফ করা হয়। তুষার কুঠার পর্বতারোহীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

ইন্‌কাট হোল্ড (Incut Hold)- শিলাখণ্ডের গায়ে গভীর আড়াআড়ি ফাটল, যাতে আঙুল অথবা পায়ের ভাল গ্রিপ হয়।

ইনসারটেড চোক্‌স্টোন (Inserted Chockstone) -ফাটলের মধ্যে আরোহী কর্তৃক প্রবেশ করানো ছোট প্রস্তরখন্ড। এর দ্বারা গ্রিপ অথবা অ্যাংকর করা যায়।

জ্যামড্ নট(Jammed Knot) - রানিং বিলে করার সময় স্লিং-এ গিঁট লাগিয়ে ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করানো আর একটি নিরাপদ উপায়। এতে ফাটলের মধ্যস্থিত গিঁট দেওয়া স্লিং খুলে আসার আশংকা থাকে না।

জ্যামড্ নাট (Jammed Nut)- ফাটলের মধ্যে আটকানোর জন্য স্লিং-এ বিভিন্ন আকারের ধাতব-নাট লাগানো থাকে এবং প্রয়োজন মতো ফাটলের আকারের নাট আটকে যায় স্লিং সমেত ফাটলের মধ্যে।

জাগ হ্যাণ্ডেল হোল্ড (Jug Handle Hold) - বড় ইন্‌কাট ফাটল, যার মধ্যে হাতের আঙ্গুল ভাঁজ করে ধরা যায়।

কারাবিনার (Karabiner) - ডিম্বাকার ধাতব ক্লিপ। একটি দরজা আছে, যর মধ্য দিয়ে আরোহণের দড়ি অথবা স্লিং প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায়। পুলির মতো কাজ করে। রানিং বিলে, অ্যাংকর,এ্যাবসেল ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

নিটিং (Knitting) - দড়ি জড়িয়ে যাওয়া বা গিঁট লাগা।

লেব্যাক (Lay back)- লম্বালম্বি ফাটল ধরে শরীর পিছনে ঝুলিয়ে হাত এবং পা নিকট দূরত্বে রেখে আরোহণ।

লিডার (Leader) -শৈলারোহণে রোপের প্রথম আরোহী অর্থাৎ নেতা।

লিপ্ (Lip) -ওভারহ্যাং পাথরের প্রান্ত।

ম্যাণ্টেলশেলফ্ (Mantelshelf) -রক্ ফেসের গায়ে সমতল সংকীর্ণ তাক বিশেষ। এর ওপরে অথবা নিচে ধরার মতো হোল্ডস্ থাকে।

ন্যাচারাল ক্লাইম্ব (Natural Climb) -রক্ ফেসের সহজতম পথে আরোহণ। খাড়াই শীর্ষ আরোহণের জন্য ফাটল, চিমনী, স্ল্যাব ইত্যাদি যা পাওয়া যাবে তার সুযোগ নিয়ে আরোহণ করা। ন্যাচারাল ক্লাইম্ব আর্টিফিস্‌ল ক্লাইম্ব-এর ঠিক বিপরীত।

নিড্‌ল্‌ (Needle)-সুউচ্চ খাঁজকাটা শৈলশিখর।

নোজ্‌ (Nose)-নিরেট খাড়া শৈলশিরা।

পাস্‌ (Pass)-গিরিবর্ত্ম। সুউচ্চ গিরিশিরার ওপর দিয়ে পাহাড়ের উভয় দিকের উপত্যকাকে যুক্ত করেছে।

পেগ (Peg) - স্টিল, ধাতু অথবা লোহার তৈরি পেরেক বিশেষ।

পেগ হ্যামার (Peg Hammer)-ফাটলের মধ্যে পেরেক লাগাবার ছোট হাতুড়ি।

পেন্ডুলাম (Pendulum) - শৈলপ্রাচীর আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করার সময় পতনের ফলে আরোহীর বিলে দড়িতে দোলায়মান ঝুলন্ত অবস্হা অবশ্য কঠিন আরোহণের সময় ফাটলশূন্য স্হান অতিক্রম করার জন্য ঘড়ির দোলক যন্ত্রের মতো ঝুলে পার হওয়াকেও পেন্ডুলাম ক্লাইম্ব বলে।

পিন্‌সার গ্রিপ (Pincer Grip) -হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে শিলার ফাটলে দেহের ভারসাম্য রাখা।

পিন্যাক্‌ল্‌(Pinnacle) - সূচলো শিখর। শৈলপ্রাচীরের সূচলো কঠিন অংশই পিন্যাকল্‌।

পিচ্‌ (Pitch)-দু'জন আরোহীর মধ্যবর্তী আরোহণ পথের অংশ বিশেষ।

পিটন (Piton) -ধাতববস্তু, স্টিল অথবা লোহার তৈরি পেরেক বিশেষ। মাথার দিক চ্যাপটা এবং নিচের দিক ক্রমশ: সরু। মাথায় গোলাকার গর্ত আছে। সূক্ষ্ম ফাটলযুক্ত শৈলগাত্রে পিটনের সাহায্যে গ্রিপ তৈরি করা যায়। পিটন আর পেগ একই কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রেসার হোল্ড (Pressure Hold) - কোমরের উচ্চতায় শিলাগাত্রে হাতের চাপ দিয়ে উপর দিকে আরোহণ প্রক্রিয়া।

প্রোটেকশন (protection) -আরোহণ-অবরোহণের সময় পতনের দূরত্ব কমানোর জন্য যে রানিং বিলে লাগানো হয়।

র‍্যাপেল্‌ (Rappel)- এ্যাবসেল দেখো।

রলবোল্ট (Rawlbolt) -ওভারহ্যাং রক্‌-এর নিচের ছাদ বা সিলিং-এ ধরার মতো কোনো ফাটল না থাকে, তাহলে ড্রিলের সাহায্যে শৈলগাত্রে গর্ত করে রলবোল্ট লাগিয়ে তাতে ক্যারাবিনার ক্লিপ করে ভাল হোল্ড তৈরি করা যায়।

রিব্‌ (Rib)-রকের সূক্ষ্ম ধার।

রিজ্‌ (Ridge)- সুউচ্চ গিরিশিরা। এর উভয় পার্শ্বে উপত্যকা থাকে। সুক্ষ্ম ধাতু শৈলশিরাকেও রিজ্‌ বলে।

রুফ্‌ (Roof) ওভারহ্যাং শিলার নিচের ছাদ।

রুট (Route) -শৈলরোহণ বা পর্বতারোহণের নির্দিষ্ট পথ।

রানিং বিলে (Running Belay)- কঠিন শৈলগাত্র আরোহণের সময় পাথরের খোঁচ অথবা পিটনের সাহায্যে অ্যাংকর করে তার মধ্যে ক্যারাবিনার ও স্লিং দিয়ে নিরাপদ হওয়া। রানিং বিলে থাকলে পতনের দূরত্ব কমে যায় এবং আরোহীর মনোবল বাড়ে।

রান-আউট (Run -out)- শৈলগাত্র আরোহণের সময় লিডারের প্রয়োজন মতো ব্যবহৃত দড়ির অংশ।

স্যাড্‌ল্‌ (Saddle) - একই গিরিশিরার উপর দুটি শিখরের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ গিরিবর্ত্ম। অনেকটা ঘোড়ার পিঠে বসার জিন্‌-এর মতো দেখতে।

স্কুপ্‌ (Scoop)- শিলাগাত্রে গোলাকার খাঁজ বা গর্ত।

স্ক্রি (Scree) - পর্বতগাত্রের নিচে স্তূপীকৃত ছোট বড় পাথর ও বালি।

সেকেন্ড-ম্যান (Second man) - দ্বিতীয় আরোহী। শৈলারোহীদলের নেতার প্রধান সহকারী।

শার্প এণ্ড (Sharp End) -শৈলারোহীদলের নেতার দিকের দড়ির অংশ।

সাইড হোল্ড (Side Hold) -হাত দিয়ে ধরার পার্শ্ববর্তী ফাটল। এই ফাটল এক হাতে ধরে দেহের ভারসাম্য রেখে আরোহণ করা যায়।

স্ল্যাব্ (Slab) -৩০ থেকে ৭৫ ডিগ্রি কোণাকুণি খাড়াই শিলাখণ্ড।

স্লিং (Sling) - নাইলন অথবা ম্যানিলা দড়ির তৈরি গোলাকার লুপ। স্লিং দিয়ে এ্যাবসেল, অ্যাংকর, রানিং বিলে ইত্যাদি করা যায়।

স্পাইক বিলে (Spike Belay) -রকের খোঁচ ইত্যাদিতে অ্যাংকর করে আরোহণ-অবরোহণে দড়ির সাহায্যে বিলে করা।

স্পার্ (Spur) - গিরিশিরা। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা শিরদাঁড়া বিশেষ।

স্ট্যান্স্ (Stance)- বিলে করার সময় শৈলগাত্রে পা রাখার মতো ফুট হোল্ডস্- এ নিরাপদে দাঁড়ানো অবস্থা।

স্টম্যাক্ ট্রাভার্স (Stomach Traverse) - আড়াআড়ি বা হরিজন্টল্ চিমনীর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠা।

স্ট্র্যাড্লিং (Straddling) -ব্রিজিং দেখো।

টেরাস্ (Terrace) -পাহাড়ের শীর্ষে অথবা পাদদেশে অবস্থিত ঘাসের জমির ঢাল।

থ্রেড্ বিলে (Thread Belay) - বৃক্ষ অথবা চোক্স্টোন অথবা পাথরের গর্তে স্লিং অথবা দড়ির সাহায্যে অ্যাংকর করে বিলে করার প্রথা।

ট্র্যাভার্স (Traversre)- আড়াআড়ি ফাটল ধরে আরোহণ। এ প্রক্রিয়ায় উপরের চেয়ে পাশেই ভাল আরোহণ করা হয়।

আণ্ডারকোট্ হোল্ড (Undercut Hold) -আড়াআড়ি ফাটল বা রক্ ফেসের নিচে লুকানো জায়গায় থাকে এই ফাটল। ফাটলে হাতের আঙ্গুল রেখে বাইরের দিকে ঝুলে আরোহণ করতে হয়।

ওয়াল (Wall) -৭৫ ডিগ্রি কোণাকুণি শিলাগাত্র বা রক্ ফেস। কিছুটা ঝুলন্ত অবস্থায় বা ওভারহ্যাং থাকে।

ওয়েজ্স (Wedges) -বড় ফাটলে যেখানে রক্ পিটন কাজে লাগে না সেখানে কাঠের তৈরি মোটা চোক্ ব্যাবহার করা হয়। এর দ্বারা ভাল অ্যাংকর হতে পারে।

ওয়েজিং (Wedging) -ফিসার্ জাতীয় ফাটলের মধ্যে বাহু এবং পা প্রবেশ করিয়ে আরোহণ করা।

উইলিয়াম মিডোজ টেইলরের অমর কাহিনী কনফেশনস্ অব আ ঠাগ অবলম্বনে

আমাদের টাইম মেশিন গিয়ে নেমেছে ঊনিশ শতকের মধ্যভারতে ঠগীদের পাড়ায়। ঠগীসম্রাট আমীর খানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি কেমন করে সে ঠগী হয়ে উঠলো তাই দেখতে দেখতে। বাবা মায়ের হত্যাকারী ইসমাইল নামের এক ঠগীর কাছে বড় হয়ে উঠছিলো আমীর খান। সে একটু বড় হতে বাইরের জগতে কাপড় ব্যবসায়ী বলে পরিচিত ইসমাইল তার কাছে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে তাকে দলে টানল। এই সময় একদিন একটা ঘটনা থেকে আমীর ইসমাইলের সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় পেল। গ্রামে একটা বাঘিনী মানুষ মেরেছিল। গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে বাঘ মরতে চলল দিলদার খান নামে একজন ভিতু কিন্তু বড় বড় কথা বলা লোকের নেতৃত্বে। ইসমাইলও যখন আমীরকে নিয়ে তাদের সঙ্গ নিল তখন সে তাদের নিয়ে ঠাট্টাও করল। ইসমাইল কিছু বলল না, শুধু চুপচাপ চলল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর----

আরও খানিকটা এগোতে দেখা গেল একটা ঝোপের আশেপাশে হাড়গোড় , ছেঁড়া কাপড়চোপড় আর এক অভাগা শিকারের মাথাটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছিল, বাঘিনীটা কাছাকাছিই রয়েছে। এইবারে দেখা গেল খান বেশ ভয় পেয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, ''এ-এটা হলো গিয়ে পুরুৎ বাঘ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। সাক্ষাৎ শয়তানের ব্যাটা! পাগলা ফকির শা ইয়াকুবের অতৃপ্ত আত্মা ওর মধ্যে গেড়ে বসেছে। বন্দুকের গুলিতে একে মারা যাবে না। না হে বাপু, এই শয়তানের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নিজের জীবনটা খোয়ানো মোটেই কাজের কথা নয়।''

ভিড়ের মধ্যে ছিল একটা ভারি ফাজিল ছেলে। সে হঠাৎ ফোড়ণ কাটল, ''না হে খান। পুরুৎ বাঘ হবে কোত্থেকে? এটা তো বাঘিনী। বাঘিনী আবার কবে থেকে পুরুৎ বাঘ হয়? তুমি বোধয় আমাদের নিয়ে রসিকতা করছ, তাইনা? আর যদি শা ইয়কুবও হয় তাহলেও পরোয়া করি না। আমরা পঞ্চাশটা শা ইয়াকুবের দাড়ি উপড়োতে পারি।''

''চোওপ্!! এমন উল্টোপাল্টা কথা বলিস না বাবা! পুরুৎ বাঘ কিন্তু বানানোও যায়, সে কি জানিস না বাপ! আসিরগড়ের কাছে একবার দেখেছিলাম! গাঁয়ের লোকে পুজোর বলি জুটিয়ে দেয় নি বলে এক ফকির রেগেমেগে একটা পুরুৎ বাঘ বানিয়ে এলাকায় ছেড়ে দিয়েছিলো।''

''বলো কি? তা কেমন দেখতে ছিল বাঘটা?'' একসঙ্গে গোটা দলটা প্রশ্ন করে উঠল। গল্পের লোভে আসল বাঘিনীকেই তখন লোকে ভুলে গিয়েছে।

'' দেখতে---কী আর বলব--'' খান একহাতে গোঁফটা চুমড়ে আর অন্য হাতে কোমরবন্ধটা চেপে ধরে একটু ভেবে নিল, তারপর ফের বলল, ''মুণ্ডুটা সাধারণ বাঘের দুনো বড়, একেকটা দাঁত একহাত

করে লম্বা, চোখগুলো যেন আঙরার টুকরো, রাতের বেলা মশালের মত জ্বলতো। লেজ--উঁহু, লেজ ছিলোনা। আর--''

খানের কথাটা শেষ হবার আগেই আমাদের হাসিঠাট্টা বন্ধ করে দিয়ে একেবারে কাছে থেকে একটা বিকট হুংকার শোনা গেল। আর তার পরেই, বাঘিনীটা তার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে লেজ উঁচিয়ে ছুটে গেল আমাদের পাশ দিয়ে।

'' সেই ফাজিল ছোকরা এবারে বললো, ''ও খান, এটা তো তবে পুরুৎ বাঘ নয়। দেখলে না কতোবড় লেজ! তোমার দিকে তাক করেই নাড়িয়ে গেল আবার।''

খান তখন একেবারে দিশেহারা। বলে, ''লেজ থাক কি না থাক, এর ওপরে শয়তান ইয়াকুব ভর করে আছে , আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমি বাবা এর সঙ্গে কোন ঝামেলায় নেই। শয়তানকে কি মারা যায়? ও তো এক ফুঁয়ে আমাদের সবকটাকে একেবারে সটান নরকে নিয়ে ফেলতে পারে!''

শুনে লোকজন চেঁচিয়ে উঠে বলে, ''ভিতু, কোথাকার! যত সাহস তোমার গ্রামের মধ্যে। এখন সাহস গেল কোথায়?''

''কে আমায় ভিতু বলে রে? কার মাথায় দুটো মাথা? আমার সঙ্গে আয় দেখি, দেখিয়ে দিই আমি ভিতু না সাহসী?'' বলতে বলতে খান সটান হাঁটা লাগাল, তবে যেদিকে বাঘিনী গেছে তার উল্টোদিকে।''

''আরে আরে ওইদিকে কোথায় যাচ্ছো? বাঘ তো উল্টোদিকে গেছে!'' বলতে বলতে সবাই মিলে হাসাহাসি শুরু করে দিলো।

এইবারে আমার বাবা এগিয়ে এলো। বলে, ''কি ছেলেখেলা হচ্ছে? কিছু যদি করতেই হয় তবে হাসাহাসি বন্ধ করে সামনে এগোও সব।''

তাই শুনে সব চুপচাপ হয়ে গিয়ে বাঘ যেদিকে গেছে সেইদিকে হাঁটা শুরু করল। খানিক বাদে আমরা এসে পড়লাম একটা ফাঁকা ময়দান মতো জায়গায়। তার একপাশে একটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি টিলা। দলে ছিল এক বুড়ো শিকারি। টিলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, '' ওইখানে আছে। বাঘ লুকোবার এতো ভালো জায়গা আমি আগে দেখিনি।'' আমরা তখন টিলাটার থেকে বড়জোর ত্রিশ হাত দূরে। দিলদার খান বাঘিনীর এত কাছাকাছি থাকতে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। ভারী সরু গলায় সে এবার বলল, ''আমার একটি নিবেদন আছে। এই হাতে অনেক বাঘই মেরেছি। বাঘ কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় সে আমার ভালোই জানা আছে। তাছাড়া আমার কাছে সবচেয়ে ভাল অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। কাজেই, আমি ওই দূরের ঝোপটার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে বসি, কেমন? আমি ঠিক জানি, ওর পাশ দিয়ে জানোয়ার যাবার যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে , তাড়া খেয়ে বেরোবার পরে বাঘিনীটা ওই রাস্তাটা ধরেই ছুটবে। আর তখন তোমরা দেখবে দিলদার খানের হাতে তার কী দশা হয়! ইনসাল্লা, তলোয়ারের একটা খোঁচায় কলজেটাই ফুটো করে দেবো ব্যাটা ইবলিশের।'' দিলদার খানের আঙুল অনুসরণ করে আমরা দেখলাম, প্রায় দুশো হাত দূরে , গ্রামে যাবার রাস্তাটার ধারে একটা ঝোপের দিকে দেখাচ্ছে সে।

বাবা হাসি চেপে বলল,''ওহে দিলদার খান, তুমি ওই দূরের ঝোপটার কথা বলছ নাকি? ও তো বেজায় দূরে। ওখান থেকে তো বাঘটাগ দেখা পর্যন্ত যাবে না।''

''হা:। আমার ওপর ভরসা রাখো ভায়া,''এই বলে দিলদার খান তাড়াতাড়ি উল্টোমুখে ছুট মারল।

বাবা হেসে বলল, ''বলেছিলাম, এ ব্যাটা এ'রকমই কিছু একটা করবে শেষ পর্যন্ত! বাঘের গন্ধটুকু পেলেও সটান উল্টোমুখে ছুট মারবে। যাক গে! এসো এবারে , দেখি কী করা যায়। খান যখন বলছে দূর থেকেই বাঘ মারবে, তখন আমাদেরই যা করবার করতে হবে। দেখি মানুষখেকোটাকে বের করে আনা যায় কিনা।''

গোটা দলটাকে এবারে তিনটে ভাগে ভাগ করে নেয়া হল। দুটো দল যাবে টিলাটার দুদিক ঘিরে, আর তিন নম্বর দলটা টিলার পেছনদিক দিয়ে গিয়ে টিলার ওপরে চেপে বাঘিনীটাকে চোখের নাগালে পেলে ওপর থেকে গুলি করবার চেষ্টা করবে, আর তা না পারলে পাথরটাথর ছুঁড়ে সেটাকে বাইরে বের করে আনবার চেষ্টা করবে। সেইমতো কাজ তো শুরু হয়ে গেল, কিন্তু বাঘিনীর দেখা নেই। যতই হইচই করি না কেন আমরা, তার তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দই নেই। আমি ছিলাম দু নম্বর দলটার সঙ্গে। সঙ্গে একটা তলোয়ার আর একটা হালকা ঢাল ছাড়া আর কিছুই নেই। আসলে আমি তো দলে ছিলাম দর্শক হিসেবে।

খানিক বাদে তিন নম্বর দলটা টিলার মাথায় দেখা দিল। তাদের একজন একটা মস্তোবড় পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, ''সবাই তৈরি তো? আমি এবারে পাথরটা নিচে গড়িয়ে দেবো।''

বাবা চিৎকার করে জবাব দিলো, ''বিসমিল্লা। ফেল ফেল, পাথরটা ফেল।''

ওমনি ওপরের দলটা সবাই মিলে পাথরটাকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিলো নিচে। পাথরটা বাজ পড়ার মতো শব্দ করে নিচের দিকে গড়াতে গড়াতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্য সব একেবারে চুপচাপ। কিন্তু তারপরও দেখা

গেলো বাঘিনীর কোন সাড়া নেই।

''ভালো করে দেখো ওপর থেকে, দেখা যায় কি না। দেখতে পেলেই গুলি চালাবে।''বাবা নিচে থেকে আওয়াজ দিলো। লোকগুলো তখন ওপর থেকে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একজন একদিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখালো।

''আল্লা! দেখতে পেয়েছে, দেখতে পেয়েছে,''বাবা চিৎকার করে সাবধান করে দিলো সবাইকে, ''সবাই সাবধান। একবার ছুট লাগালে কারো রক্ষা নেই।''

বন্দুকওয়ালারা সবাই দেশলাই জালিয়ে তৈরি হয়ে রইলো। খানিক বাদে টিলার ওপরে দাঁড়ানো দলটার একজন বন্দুক তুলে গুলি চালালো। ওমনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন উঠলো একটা। আর তার পরেই গর্জন করতে করতে ছুটে বের হলো বাঘিনীর বাচ্চাটা। সেটও বেশ বড়োসড়ো। নীচের দলের অন্য একজন এবার সেটাকে আর একটা গুলি করল। দু নম্বর গুলিটা খেয়ে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল তার।

''এইবারে আসল কাজ,'' বাবা বললো। বাচ্চা হারিয়ে বাঘিনীটা একেবারে ক্ষেপে থাকবে। এবারে কিন্তু বিপদ আছে। তবে তোমাদের টিপ ঠিক থাকলে কোন ভয় নেই। আমি কখনো নিশানায় ভুল করিনা, কিন্তু এক গুলিতে মরতে না-ও পারে জানোয়ারটা। কাজেই সাবধান সব।'' এই বলে বাবা ওপরের দলটাকে আরো একটা পাথর ফেলতে বলল নিচের দিকে।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমি

হলুদ সূর্যমুখী ও রঙীন প্রজাপতি

মহাশ্বেতা

ছবি আঁকতে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। রুমপাও ভালোবাসে। একদিন সকালবেলা ফুলভর্তি বাগানে বসে এঁকেও ফেলল একখানা সুন্দর ছবি। সূর্যমুখী ফুলের ছবি। ফুলগুলো যেন সত্যিকারের। একটা বোকা প্রজাপতি তাই বুঝতে না পেরে, মধুর খোঁজে সেই সূর্যমুখীর ছবিতেই এসে বসলো। তাই দেখে রুমপার কি আনন্দ!

তোমাদের মধ্যে যাদের ছোট ভাই কিম্বা বোন আছে, তারাই বলতে পারবে, ছোট ভাই-বোনেরা বড় দাদা-দিদিদের কি পরিমাণ বিরক্ত করে। রুমপারও আছে একটা দুষ্টু ভাই। তার নাম টুবিন। কথায় কথায় তার খালি হাসি। যেন রুমপা কোন সার্কাসের ক্লাউন। রুমপা তার হাসিতে কান না দিয়ে যখন আবার তার ছবিতে মন বসালো, তখন হঠাৎ মনে হল কে যেন তার পিঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। নরম কোন একটা জিনিস। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে কত প্রজাপতি! লাল, নীল, হলুদ, গোলাপী - আরও কত রঙের হাজার হাজার প্রজাপতি। দেখে তার মন খুশিতে ভরে গেল। দৌড়ে একটা কাগজ বের করে এঁকে ফেলল আরও সুন্দর একটা ছবি। একটা বিশাল প্রজাপতির ছবি। পাখাতে তার উজজল সব রঙ।
আঁকা শেষ হতে রুমপার মনে হল এই যেন প্রজাপতিটা উড়তে লেগেছে - এতই জীবন্ত লাগছিল সেটাকে। দেখতে দেখতে প্রজাপতিটা যেন কাগজ থেকে বেরিয়ে বড় হতে গেল। বড় হতে হতে

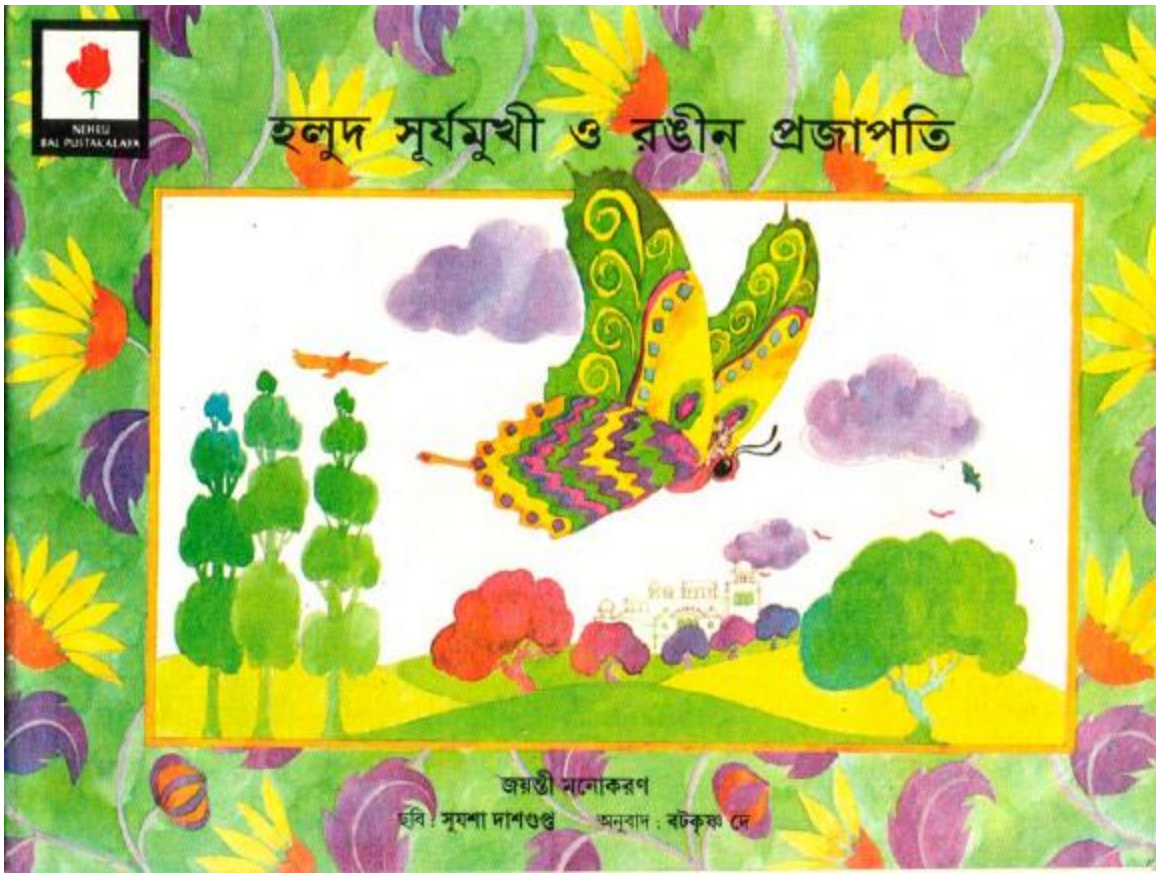

একেবারে প্রকাণ্ড হয়ে গেল। তারপর রুমপাকে তার পিঠে বসিয়ে নিয়ে গেলে অদ্ভুত এক স্বপ্নের রাজ্যে। কি মজা! কিন্তু সেই রাজ্যেও টুবিন উপস্থিত। আর সেরকম ছোটখাটো কিছু নয়, টুবিন সেই রাজ্যের স্বয়ং যুবরাজ! রুমপা অবাক!

তারপর? আর তো বলা যাবে না। সব জেনে গেলে তো মজাটাই নষ্ট। তার চাইতে পড়ে নাও জয়ন্তী মনোকরণ-এর 'হলুদ সূর্যমুখী ও রঙীন প্রজাপতি'। বইয়ের পাতা ভর্তি রঙবেরঙের চোখ-জুড়ানো সব ছবি। গল্পটাও ছুটির দিনের দুপুরে পড়ার একেবারে উপযুক্ত। পড়ে জয়ঢাককে জানিও কেমন লাগলো, কেমন?

কিছু তথ্য-
লেখা: জয়ন্তী মনোকরণ
ছবি: সুযশা দাশগুপ্ত
অনুবাদ: বটকৃষ্ণ দে
দাম: ১৬ টাকা
প্রকাশনী: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

লোককথা

আনানসি গেল মাছ ধরতে

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

বোকা আনানসি একবারে ঠিক করল পাশের বাড়ির জেলেকে বোকা বানাবে। অনেক বুদ্ধি টুদ্ধি করে সে গিয়ে জেলেকে ধরে বসল, 'চল আজ তোতে আমাতে মাছ ধরতে যাই।'

জেলে তো জানে বোকা আনানসি তাকে বুদ্ধু বানাবর চেষ্টায় আছে। সে বলল, 'হ্যাঁ, চল। কাজ ভাগাভাগি করে নেয়া যাক আগে। আমি জাল ফেলব আর তুই আমার হয়ে একটু ঘুমিয়ে নিবি।'

আনানসি ভাবল, জেলে বুঝি তাকে ঠকাবার কোন ফন্দি এঁটে এমন কথা বলছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না , তার চেয়ে আয় আমিই জাল ফেলি, তুই বরং আমার হয়ে ঘুমিয়ে নিস নৌকোয় শুয়ে।'

'জেলে হতাশ হবার ভান করে বলল, 'ঠিক আছে। তুই যেমনটা বলবি তেমনটাই হবে।'

তারপর তো দুজনে মাছ ধরতে গেল। সারারাত নৌকোয় শুয়ে জেলে ঘুম দিল আর জেগে জেগে মাছ ধরল আনানসি। সারা রাত চেষ্টা করে উঠল চারটে বিশাল বিশাল মাছ।

সকলে জেগে উঠে জেলে বলল, 'ছ্যা:। এইটুকুটুকু চারটে মাছ মাত্তর। কালকে নিশ্চয় আরো বেশি মাছ উঠবে। শোন আনানসি, আজকের মাছচারটে তুই নিয়ে যা, কালকে যা উঠবে সেগুলো আমি নেবো'খন।'

'ভেবেছিস বুঝি চালাকি করে আমায় ঠকাবি আর কালকের বেশি বেশি মাছ নিয়ে ঘরে যাবি? সেটি হচ্ছে না। কক্ষণো না,' বললো আনানসি, 'আজকের মাছ তোর। কালকে যা উঠবে সেগুলো আমি নেবো।'

‘ঠিক আছে। কী আর করা। তবে তাই হোক,’ এই বলে বিশাল বিশাল চারখানা মাছ নিয়ে জেলে হাসতে হাসতে ঘরে গেল।

পরদিন মাছ ধরতে গিয়ে সারা রাত চেষ্টা করেও একটাও মাছ উঠল না। সকালবেলা তাই দেখে জেলে বলল, ‘জালটা পচে গেছে, বুঝলি আনানসি। তুই বরং এক কাজ কর। জালটা তোকেই দিয়ে দিলাম। বাজারে গিয়ে ওটা বেচে আয়, অনেক পয়সা পাবি।’

বোকা আনানসি মহানন্দে জাল ঘাড়ে করে এসে বাজারে বসে হাঁকল, ‘ পচা জাল নেবে গো, অনেক টাকা দাম পাবো।’

তাই শুনে বাজারের লোকেরা তাকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিল। বোকা আনানসি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল। জেলেকে ঠকানো আর তার হলো না।

পশ্চিম আফ্রিকার লোককথা

ছবিঃ মৌসুমি

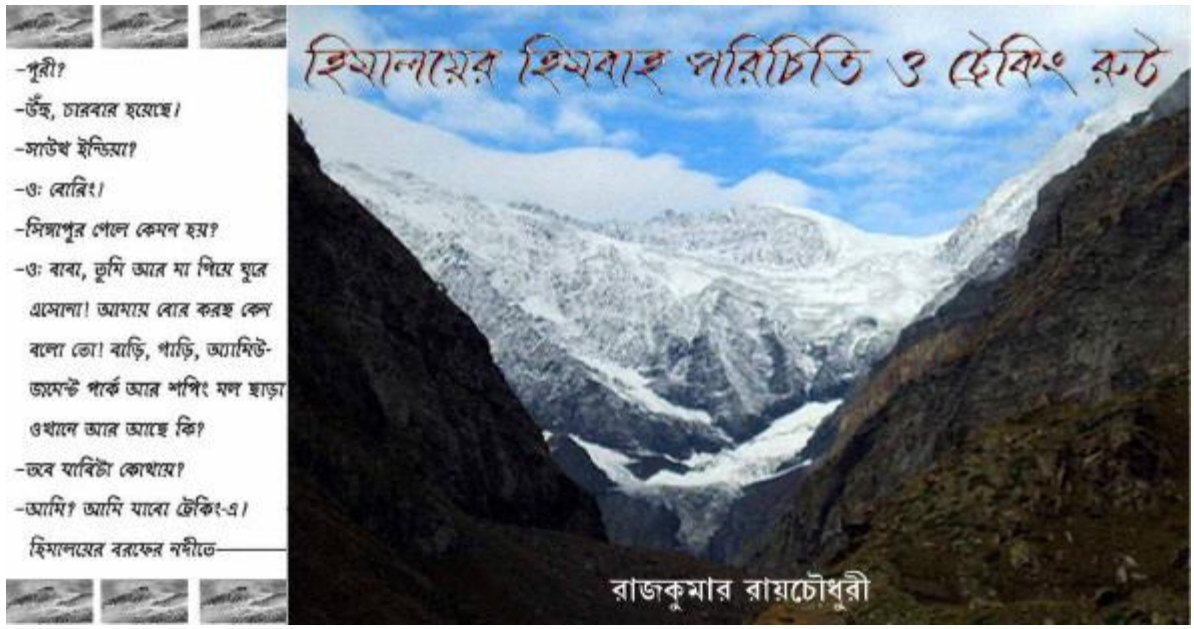

ট্রেকিং রুটঃ- বেস ক্যাম্প : উত্তরকাশী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
হৃষীকেশ - উত্তরকাশী	১১৫০ মি	১৫১ কিমি	বাস
উত্তরকাশী - বুক্কী	১৫০০ মি	৩৪ কিমি	,,
বুক্কী - জঙ্গল ক্যাম্প	২৬৫০ মি	৭ কিমি	হাঁটা
জঙ্গল ক্যাম্প - গুড্জর কুঁড়ে (Gujjar hut)	৩৪৫০ মি	১০ কিমি	,,
গুড্জর কুঁড়ে - ডক্রিয়ানী	৩৮০০ মি	৫ কিমি	,,

হৃষীকেশ থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে উত্তরকাশী। উত্তরকাশী এখন বেশ বড় জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে সময় থাকলে বিশ্বনাথের মন্দির দেখে আসতে পারেন। নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটও উত্তরকাশীতে। শহর থেকে ৫ কিমি দূরে।

পরের দিন সকালে বাসে বা জিপে করে পৌঁছন বুক্কীতে। উত্তরকাশী থেকে অবশ্যই গাইড ও পোর্টার সঙ্গে করে আনবেন। রসদ উত্তরকাশী থেকে বা যাবার পথে ভাটোয়ারী থেকে নেওয়া যেতে পারে। পাঁচদিনের মত চাল ডাল এবং অন্যান্য খাবার নিয়ে যেতে পারেন। বুক্কী বাস স্টপ থেকে ভাগীরথীর উপর একটি ছোট সেতু পার হয়ে ২ কিমি দূরে বুক্কী গ্রাম। এখান থেকে কিছু হাঁটলেই বাঁদিকে দেখা যাবে গঙ্গোত্রী শৃঙ্গ।

বুক্কী থেকে ৫ কিমি দূরে পড়বে তেলা গ্রাম। খুবই ছোট গ্রাম। ক্যাম্পিং করার উপযুক্ত জায়গা। তবে আরো ২ কিমি দূরে জঙ্গল ক্যাম্পে আজকের তাঁবু খাটানোই ভাল হবে কারণ পরের দিন বেশ চড়াই ভাঙতে হবে। জঙ্গল ক্যাম্প থেকে গুড্জরহাট যাবার রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। অনেকগুলি ছোটখাটো নদী পার হতে হবে। বেশ চড়াই এর পর একটা পাহাড়ের চূড়ার

উপর রাস্তা। অবশেষে গুজ্জরহাট জায়গাটা একটি বুগিয়াল বা চারণ ভূমি। গুজ্জররা গ্রীষ্মকালে মোষ ও গরু নিয়ে এখানে আসে, থাকার জন্য বেশ বড় বড় ঘর বানানো। শীতের প্রারমভেই সবাই নীচে নেমে যায়। কাছেই আছে একটি মনোরম জলাশয়, নাম খেরাতাল। খেরাতাল ঠিক

গুজ্জরদের কুঁড়েঘরগুলির নীচে। ব্যাঙাচি আকৃতির হ্রদ। আজকের বিশ্রাম খেরাতালের ধারে হতে পারে। তবে খালি থাকলে গুজ্জরদের ঘরে রাত কাটানোই ভাল। ঘাস ও বিচালী দিয়ে তৈরি বিছানা বেশ আরামপ্রদ। এখানে বেশ ঠান্ডা। পরের দিন ৫কিমি হেঁটে পৌঁছন ডক্‌রিয়ানী হিমবাহের স্নাউটের কাছে। হিমবাহটি দূর থেকে দেখলে চীনের প্রাচীরের কথা মনে হবে। দুধারে সুউচ্চ বরফের প্রাচীর। খেরাতাল এবং ডক্‌রিয়ানী হিমবাহ দর্শনে যে কোন ভ্রমণার্থীই যেতে পারেন, শুধু সঙ্গে নেবেন তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, ভাল জুতো, গরম জামা কাপড়, যথেষ্ট রসদ এবং অবশ্যই পোর্টার ও গাইড।

চোরাবারি a¢ï (Chorabari Glacier)

যাঁরা কেদার বদ্রী বেড়াতে যান তাঁরা অল্পায়াসেই চোরাবারি হিমবাহ ঘুরে আসতে পারেন। তাঁবু বা স্লিপিং ব্যাগ কিছুই দরকার হবে না। কেদারনাথ থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে অবস্থিত এই হিমবাহটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ কিমি। হিমবাহটির উৎপত্তি কেদারডোম, ভার্তেখুন্টা ও কীর্তিস্তে র দক্ষিণ ঢাল থেকে। এই হিমবাহের নীচের দিকটি ল্যাটেরাল মোরেনের পাথর ও বোল্ডারে ঢাকা। হিমবাহের স্নাউটের উচ্চতা ৩৮০০ মি। মন্দাকিনী নদীর উৎসস্থলও এই হিমবাহ।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প : কেদারনাথ

	উচ্চতা	দূরত্ব	রাস্তা	
	(মি)	(কিমি)		
হৃষীকেশ - গৌরীকুন্ড	১৯৫০ মি	২১৬ কিমি	বাস	
গৌরীকুন্ড - কেদারনাথ	৩৫৮০ মি	১৪ কিমি	হাঁটা	(ঘোড়া)
কেদারনাথ - চোরাবারি	৩৮০০ মি	৩ কিমি	হাঁটা	

হৃষীকেশ থেকে বাসে বা গাড়িতে রুদ্রপ্রয়াগ আসুন। হৃষীকেশ থেকে দূরত্ব ১৪১ কিমি উচ্চতা ৬০০মি। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থল এবং কেদারনাথ বদ্রীনাথের রাস্তারও সঙ্গম স্থল। একদিকের রাস্তা যোশীমঠ হয়ে চলে গেছে বদ্রীনাথে আর অন্যদিকের পথ শোনপ্রয়াগ হয়ে গেছে কেদারনাথ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পরের দিন গৌরীকুন্ডে আসুন, দূরত্ব ৭৩ কিমি, সময় নেবে ৬ থেকে ৭ ঘন্টা।

গৌরীকুন্ডে সোজাসুজি আসতে পারেন হৃষীকেশ থেকে তবে সারা দিন লেগে যাবে। যেখান থেকেই গৌরীকুন্ডে আসুন গৌরীকুন্ডে এক রাত কাটাতেই হবে। পরের দিন সকালে রামওয়াড়া গরুড়চটি হয়ে কেদারনাথে পৌঁছন। এ পথে ঘোড়া, কান্ডি ও ডান্ডি ও পাবেন। কান্ডি একটা ঝুড়ির মত লম্বাটে সিট যা একজন মালবাহক টেনে নিয়ে যায়। ডান্ডি, লম্বা দুটো শক্তপোক্ত লাঠির ওপর আটকানো চেয়ার যাতে যাত্রী বসে থাকেন, টানে চারজন মোটবাহক।

কেদারনাথে একরাত কাটিয়ে পরের দিন ৩ কিমি দূরে হিমবাহ ও হিমবাহ সংলগ্ন চোরাবারিতাল বা গান্ধিসরোবর দেখে কেদারনাথে ফিরে আসতে পারেন। গান্ধিজির চিতাভস্ম এখানে বিসর্জন দেয়া হয়েছিলো। ক্লান্ত না হলে সে দিনই গৌরীকুন্ডে নেমে আসা যায়।

দুনাগিরি হিমবাহ

ধৌলীগঙ্গার প্রধান উপনদীর অন্যতম উৎস দুনাগিরী একটি উল্লেখযোগ্য হিমবাহ। হিমবাহটি ৫ ১/২ কিমি লম্বা। এটির সর্বাধিক উচ্চতা ৫১৫০ মি আর স্নাউটের উচ্চতা ৪২৪০ মি। এই স্নাউট থেকে একটি নদী এসে lag লীগঙ্গাতে পড়েছে।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ জুমাগ্রাম

	উচ্চতা	দূরত্ব	রাস্তা
	(মি)	(কিমি)	
হৃষীকেশ - যোশীমঠ	১৮৮০ মি	২৫৭ কিমি	বাস
যোশীমঠ - জুমা		৪৩ কিমি	বাস
জুমা - দুনাগিরি গ্রাম	৩৬১৫ মি	১০ কিমি	হাঁটা
দুনাগিরি - দুনাগিরি হিমবাহ	৪২৪০ মি	১২ কিমি	হাঁটা

হৃষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে যোশীমঠে আসুন। যোশীমঠ থেকে মালারীর পথে, যোশীমঠ থেকে ৪৩ কিমি দূরে জুমা গ্রামে বাস বা গাড়িতে আসুন এখান থেকে হাঁটা শুরু। দুনাগিরি গ্রামের পথে যেতে পড়বে কুন্তিভানার শৃঙ্গের অপরূপ দৃশ্য। পথে পড়বে ছোট গ্রাম রুঁই (ruing)। মোট ১০ কিমি হেঁটে চলে আসুন দুনাগিরি গ্রামে। অথবা চাইলে রুঁই গ্রামে রাত কাটিয়ে উঠে আসতে পারেন দ্রোনগিরি বা দুনাগিরি গ্রামে । এখান থেকে চোখ ভরে দেখুন হাতি-পর্বত, এবং হরদেওC গিরিশৃঙ্গ। দুনাগিরি গ্রামে যেতে হলে চড়াই ভাঙতে হবে অনেকখানি। দুনাগিরি থেকে পরদিন নদীর ধার ধরে দুনাগিরি হিমবাহ দেখে ফিরে আসুন। জুমাগ্রাম বা যোশীমঠ থেকে অভিজ্ঞ গাইড ও পোর্টার আনবেন। উৎসাহীরা দ্রোনগিরি নালার পাশ দিয়ে ঘন্টা পাঁচেকের পথ পেরিয়ে যেতে **পারেন বাগিনি বা মকে। (বাগিনি গ্লেসিয়ার)**

ক্রমশ

এরিট্রিয়া

সঙ্গের ছবিটি এরিট্রিয়ার মেয়ে আতিফা-র। আতিফা টিগ্রে উপজাতির মেয়ে। ধর্মে সে মুসলমান। তার নামটির অর্থ হল, ভালবাসা ও সহানুভূতি। এরিট্রিয়ার রাজধানী আসমারাতে তার বাড়ি। আতিফা ইশকুলে যায়। আফ্রিকার চূড়ান্ত অভাবী, যুদ্ধে দীর্ণ, দু:খী সব দেশের মধ্যে লোহিত সাগরের তীরের এই দেশটা একটা ব্যতিক্রম। এখানকার লোকেরা শান্তিতে থাকেন। শিক্ষার হার অত্যন্ত বেশি। টুরিজম এ দেশের প্রধান শিল্প। এই সংখ্যায় আমরা আতিফার দেশের গল্প শোনাবো।

ইথিওপিয়ার উত্তরতম অংশে রয়েছে পাহাড়ি দেশ এরিট্রিয়া। খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দি অবধি , ইথিওপিয়ার প্রথম সাম্রাজ্য আকসুম-এর এক প্রদেশ ছিল এই ভূখণ্ড। ১৬শ শতাব্দিতে অটোমান সাম্রাজ্যের দখলে আসে তা। ১৮৮৫ সালে ইটালি এর উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। ১৮৮৯ সালের উকিয়ালির সন্ধি মারফত দখলি অঞ্চলগুলো পুরোপুরি ইতালির নিয়ন্ত্রণে আসে। লোহিত সাগরের রোমান নাম 'মেয়ার এরিট্রিয়াম' অনুসারে এ দেশের নাম এরিট্রিয়া রেখেছিলো এই ইতালিয়ানরাই। ১৯৪১ সালে বৃটিশরা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দেশের দখল ইতালিয়ানদের থেকে কেড়ে নেয়।

১৯৫২ সালে এরিট্রিয়াকে ফের ইথিওপিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাস থেকে এটি ইথিওপিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এরিট্রিয়ানরা কিন্তু এটা মেনে নেয়নি। তারা নিজেদের আলাদা একটা দেশ বলেই মানে। অতএব শুরু হল ইথিওপিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম বা সিভিল ওয়ার।

দীর্ঘ তিন দশকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর, ১৯৯১ সালে এরিট্রিয়ান পিপলস্ লিবারেশান ফ্রন্ট অবশেষে এরিট্রিয়ার রাজধানী আসমারা দখল করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের মদতে এরিট্রিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে আয়োজিত হয় দেশব্যাপী রেফারেণ্ডাম বা মতদান প্রক্রিয়া। এরিট্রিয়ানরা বিপুল সংখ্যায় ভোট দেন এরিট্রিয়াকে এক সার্বভৌম দেশ হিসেবে দেখতে চেয়ে। ফলস্বরূপ ১৯৯৩ সালের মে মাসে ইথিওপিয়া স্বীকার করে নেয় এরিট্রিয়ার স্বাধীনতাকে। জন্ম হয় স্বাধীন এরিট্রিয়ার। অবশ্য এই শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। সীমান্তবর্তী এলাকার দখল নিয়ে ১৯৯৮ সালে দুই দেশে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দু বছরব্যাপী যুদ্ধে আশি হাজার মানুষের প্রাণ যায় ও দুই দরিদ্র দেশকেই

যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে উন্নত দেশেরা তার থেকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে ফেলে। অবশেষে ২০০০ সালে যুদ্ধ যখন থামল তখন অস্ত্র কিনে দুই গরিব দেশই আরও গরিব হয়ে গেছে, সীমান্ত সমস্যা কিন্তু তাঁদের অত রক্ত ও অর্থক্ষয়ের পরেও মেটেনি।

কিছু তথ্য:

জাতীয় নাম: হাগেরে এর্ট্রা

সীমা: উত্তর ও পশ্চিমে সুদান, দক্ষিণে ইথিওপিয়া ও জিবুতি, পুবে লোহিত সাগর।

মাপজোক: আয়তন ১,২১,৩২০ বর্গ কিমি। ২,২৩৪ কিমি লম্বা সমুদ্রতট।

জনসংখ্যা: ৪৯ লক্ষ ২৭ হাজার (২০০৮ সালের গণনা অনুযায়ী।) এর মধ্যে শতকরা ২১ ভাগ মানুষ শহরবাসী আর বাকিরা গ্রামবাসী। রাজধানী আসমারা ছাড়া আসাব, কেরেন, মেণ্ডেফেরা ও মাসাওয়া হচ্ছে এ দেশের নগর এলাকা। বাকি সবটাই গ্রাম অঞ্চল।

গড় আয়ু: ষাট বছর।

ভাষা: আফার, আরবী, টিগ্রে ও কুনামা, টিগ্রিনিয়া ও অন্যান্য কুশীয় উপভাষা।

বাসিন্দা: উপজাতীয় টিগ্রিনিয়া, টিগ্রে ও কুনামা, আফার (মাত্রই চার শতাংশ), সাহো (লোহিতসাগরের তীরবাসী উপজাতি এরা)

শিক্ষার হার: ৫৯ শতাংশ।(১৫ থেকে ২৪ বছরের ছেলেদের শতকরা ৮৫ ভাগ শিক্ষিত ও সে বয়সের মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষিত।)

ধর্ম: ইসলাম, এরিট্রিয়ান অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট।

মাথাপিছু আয়: ৭০০ ডলার।

কৃষিযোগ্য ভূমি : শতকরা ৫ শতাংশ।

কৃষিজ দ্রব্য: জোয়ার, মকাই, ডাল, সবজি, তুলো , তামাক, কফি ও তন্তু উৎপাদক গাছ 'সিসল'।

পশুপালন: ছাগল ও মাছ।

খনিজ: সোনা, পটাশ, দস্তা, তামা, খনিজ লবণ।
শিল্প: টুরিজম্, ফুড প্রসেসিং, কফি, বস্ত্রশিল্প, লবন, সিমেন্ট, জাহাজ মেরামতি।
রাস্তা: ৪৮০০ কিলোমিটার।
রেলপথ: ৩০৬ কিলোমিটার।
টেলিভিশন কেন্দ্র: ১টা (২০০০ সালে শুরু)।
টেলিফোন সংযোগ: ৩৭৭০০। মোবাইল: ৬২০০০।
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী: এক লক্ষ।